অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা

কেদারনাথ দত্ত

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

অধ্যাপক বানারসীনাথ ভরদ্বাজ

১৯৮৯

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০বি রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ৭০০০২৬।

কেদারনাথ দত্ত : ১৮৯২

(২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮—২৩শে জুন ১৯১৪)

অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা

কেদারনাথ দত্ত

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

অধ্যাপক বানারসীনাথ ভরদ্বাজ

১৯৮৯

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০বি রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ৭০০০২৬।

প্রকাশক ঃ—

শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বিষ্ণু মহারাজ।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

৭০বি রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা ৭০০০২৬।

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা।

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৮৩, শ্রীগৌরাব্দ ৫০৩।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীচৈতন্যমঠ**

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পিন ঃ ৭৪১৩১৩।

২। **শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট**

মুদ্রণ ঃ সারস্বত প্রেস,

শ্রীচৈতন্যমঠ।

যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থসম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাসনদীতে যুক্তিস্রোত সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবালসকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পুতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

—**শ্রীকেদারনাথদত্তস্য** (ভক্তিবিনোদস্য)।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন মায়াবাদী কেশব ভারতীর কাছে এবং পুরীতে পৌঁছিয়ে দীর্ঘ সাতদিন ধরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে বেদান্তের শঙ্করভাষ্য শ্রবণ করার পর অমিত ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সুযোগমত বিশ্ব-বিশ্রুত মায়াবাদী পণ্ডিত সার্বভৌমকে শুদ্ধ ভক্তির মহিমার কাছে মায়াবাদের তুচ্ছতা উপলব্ধি করালেন। সার্বভৌম যে মহাপ্রভুকে প্রথমে ছাত্রশিষ্যরূপে পেয়েছিলেন, আজ সেই যুবক সন্ন্যাসীকে চিরতরের জন্য শুধু গুরুরূপে নয় স্বয়ং ভগবান রূপে বরণ করে তাঁর শিষ্যত্ব অবলম্বন করলেন।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত যখন বৈষ্ণব জগতের কাছে পরিচিত হলেন তখন তিনি সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই নামে খ্যাত হলেন। বৈষ্ণব জগতে তিনি স্বনামধন্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ বলে স্বয়ং প্রকাশিত। বিশেষ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, যিনি আজ বিশ্বের সর্বত্র বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকগণের আদি গুরু বলে স্বীকৃত, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যেভাবে জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন তারপর ঠাকুর যে আর অনাবিষ্কৃত থাকতে পারেন না; এটা সত্য এবং স্বাভাবিক। শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তি ভাগীরথীর ধারা যে দিকেই প্রবাহিত হয়েছে সেখানে, যেমন ভাগীরথীর সঙ্গে ভগীরথের সম্বন্ধ, অনুরূপভাবেই রয়েছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয়।

বৈষ্ণব জগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি সুপরিচিত ও পরম শ্রদ্ধেয় নাম এবং ভক্তিজগতের ভগীরথ হিসাবেই তিনি বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তাঁর কীর্তনাদি, ভজন-রহস্য ও জৈবধর্ম এ-সমাজে বহু কীর্তিত, বহু চর্চিত ও বহু পঠিত।

প্রধানত তাঁর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের জন্যই আজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ঘরে ঘরে এত প্রচার। প্রতি গৌড়ীয় মঠে তাঁর রচিত গীতই প্রতিদিন ত্রি-সন্ধ্যা গাওয়া হয়।

তাঁর রচিত অমূল্য পারমার্থিক গ্রন্থসমূহ যেমন জৈবধর্ম, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, ভজনরহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, ভাগবতার্কমরীচিমালা, আম্নায়সূত্র, গীতি পুস্তকাবলী এবং গীতাভাষ্য, শুধু ভারতে কেন সারা বিশ্বের নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে।

সুতরাং সে দিক দিয়ে বিচার করলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তি জগতের নিকট অনাবিষ্কৃত নন সত্যই, তবে একথাও বোধ হয় ঠিকই যে সাহিত্য জগতে শ্রীল ঠাকুরের অবস্থান এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর যে কত উচ্চ-আসন থাকা প্রয়োজন সেদিকটা আমাদের মধ্যে ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের একজন সাহিত্যানুরাগী প্রাক্তন অধ্যাপক ছদ্মনামী ভরদ্বাজ নামধেয় মহাশয় শ্রীল ঠাকুরের সাহিত্যিক জগতে কত উচ্চে আসন থাকার কথা তা তাঁর এই গ্রন্থটিতে আলোচনা করে সত্যই বৈষ্ণব জগতে এবং সাহিত্যিক সমাজে কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন।

এ পর্যন্ত কোন সাহিত্য ঐতিহাসিক কেদারনাথ দত্তের (ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের) কথা বলেননি। বলেননি তাঁর বিভিন্ন ছন্দ সৃষ্টির

বিচিত্র কথা। শ্রীল ঠাকুরের বহু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দীর্ঘদিন পরে আবিষ্কার ও তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীর উপাদান সংগ্রহ প্রচণ্ড পরিশ্রমে বর্তমান গ্রন্থকার করেছেন। গ্রন্থখানি রচনায়, মতামত প্রকাশে লেখক জোরালো মনের পরিচয় দিয়েছেন, যদিও কোন ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী কিছু ভক্ত সে সব মতপ্রকাশ মেনে নিতে চান নি। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে লেখক, সাহিত্যিকের ভূমিকা গ্রহণ করেই বিচার করেছেন, কোন ধর্মের গোঁড়ামির আওতায় তিনি যান নি।

বর্তমান লেখক ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে সমানভাবে পারদর্শী হওয়ায় তাঁর পক্ষে শ্রীল ঠাকুরের ইংরাজী ও সংস্কৃত রচনার মূল্যায়ন করাও সহজ হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীবানারসীনাথ ভরদ্বাজ বার্ধক্যেও বিশেষ ভাবে কর্মক্ষম। গবেষণা ও কলমের খেলার নেশা তাঁর দীর্ঘদিনের। তাঁর প্রথম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। তাঁর সাহিত্যচর্চা ও রঙ্গচিত্র অঙ্কন (কার্টুন) শুরু হয় এরও কিছু আগে (১৯৪৫)। স্ব-নামে তিনি পার্থিব-বিজ্ঞান ও পরিবেশ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক এবং অনেকগুলি গবেষণা গ্রন্থের লেখক হলেও নানা ছদ্মনামে বহুকাল থেকে অঙ্কন ও সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। কাব্যরসিক ও ছান্দসিক হিসাবে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের উচ্চতম ক্ষেত্রে (সাহিত্যভারতী) তিনি দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেছেন। যদিও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর ইংরাজিতে লিখিত গবেষণাপত্রগুলি দেশ-বিদেশে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু সাবলীল

বাংলা ভাষায় সাহিত্যানুগ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনাতেই তাঁর বিশেষ আনন্দ। এই সাহিত্য ও গবেষণা প্রসূত ইতিহাস-প্রীতিই তাঁকে,—এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত কেদারনাথ দত্তের প্রতি আকৃষ্ট করে। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে একনিষ্ঠ সাধকের মত তিনি শ্রীল ঠাকুরের সাহিত্য-সম্ভারের রসে নিজেকে তলিয়ে দেন। তিনটি বছর তিনি সাধনার একাগ্রতা নিয়ে অনাবিষ্কৃত সাহিত্য-প্রতিভা কেদারনাথ দত্তকে আবিষ্কার ও বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠার ব্রতে মগ্ন আছেন। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণভাবে খোলা মন নিয়ে একাজে নেমেছেন; সাহিত্য-সমাজে কেদারনাথের (শ্রীল ঠাকুরের) যতটুকু পাওনা তার বেশী এতটুকুও দাবী তিনি রাখেননি। তবে যতটুকু এই অবহেলিত সাহিত্যিকের ন্যায্য পাওনা, সেটুকু পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিতে বর্তমান লেখক বদ্ধ-পরিকর।

অধ্যাপক ভরদ্বাজের রচনার হাতটি বড় মিষ্টি। একঘেয়ে ক্লান্তিকর নয় আদৌ। গম্ভীর বিষয়ের প্রকাশে মহার্ঘ শালীনতা; আবার লঘু বিষয়ের ক্ষেত্রে এসেছে অনাবিল স্বচ্ছতা। যার ফলে পাঠকের আকর্ষণকে তাঁর লেখা আগাগোড়াই ধরে রাখে।

উপরি পাওনা হিসাবে, এ গ্রন্থের লেখক স্ব-নামে অর্ধশত বছরেরও বেশী গ্রন্থাগার পরিচালনায় ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ হওয়ায়, বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ-প্রকল্প, প্রসঙ্গ-গ্রন্থ বিবরণ, নির্দেশিকা ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চমানের হয়েছে। আশা করি এই নূতন ধরণের সাহিত্য-গবেষণা গ্রন্থটি বিদগ্ধ, সাহিত্যরসিক শিক্ষক-ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের আদরণীয় হবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৫০তম আবির্ভাব-বর্ষ অন্তে এবং শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী বর্ষে এই গ্রন্থটি ইনষ্টিটিউটের গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হ'ল।

ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীচৈতন্যমঠ ও সর্বভারতীয়
তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহ।

রাসপূর্ণিমা,
৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০০২৬

ভূমিকা

একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৭-র অগষ্টে (ভাদ্র, ১৩৯৪) প্রথম কেদারনাথ দত্তের সাহিত্য প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হই। শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্ম তিথিতে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম। ভক্ত-বৈষ্ণব না হয়ে এত শ্রদ্ধেয় শুদ্ধভক্তের সম্বন্ধে কি বলব ভেবে না পেয়ে আকুল অন্তঃকরণে সভার আগে সাত দিন তাঁর জীবনীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পড়াশুনা শুরু করি। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই অবাক হয়ে যাই যে এতবড় একটা সাহিত্য প্রতিভার কথা কখনো শুনিনি কেন! সাহিত্য-ইতিহাস গ্রন্থ-গুলোর সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচয় ছিল। তবু আর একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন লেখকের গ্রন্থেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা কেদারনাথ দত্তের উল্লেখ পেলাম না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী (১৯৩৮) উপলক্ষে বেশ কিছু গৌড়ীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও কেবলমাত্র ভক্তিতত্ত্বের আলোচনাই করা হয়েছে, নিরপেক্ষ সাহিত্যিক মূল্যায়ন হয়নি। গ্রন্থগুলোতে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার হয়নি, এলোমেলোভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে। একথা ভালভাবেই বুঝলাম যে কেদারনাথ দত্তের সাহিত্য-প্রতিভা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কিছুটা আবিষ্কারের আনন্দে ও কিছুটা জেদে সন্ধান চালাতে লাগলাম, তবে সদা-সতর্ক রইলাম যেন অতি-কথন দোষে দোষী হয়ে না পড়ি। অবশ্য বার্ধক্যের জন্য সামর্থ্য সীমিত ছিল। খানিকটা অব্যব-সায়ীর ব্যবসায়ও বটে। তবে আজীবন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-

রসিক হওয়ার জন্য ক্লান্তিবোধ করিনি কখনও। একথা অকপটে বলা যায় যে কেদারনাথের সাহিত্যরসে দীর্ঘ আড়াই বছর একেবারে মজে ছিলাম। এখন সেই আনন্দের উপলব্ধি রসিক পাঠকের জন্য যথাসাধ্য আতিশয্য পরিহার করে কিছুটা পরিবেশন করার চেষ্টা হ'ল। এ চেষ্টা কতটা সার্থক হবে জানিনা।

অবশ্য গৌড়ীয় পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ কালে (৩১ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা থেকে ৩৩ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা/জুন ১৯৮৭ থেকে জুলাই ১৯৮৯ পর্যন্ত) বেশ কিছু গুণীজন পাওনার অধিক প্রশংসা করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন। প্রাচীনপন্থী কিছু বৈষ্ণবভক্ত এ-ধরণের বাস্তব, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ পছন্দও করেন নি। কিন্তু এ পাঠক-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক জেনেই পথচলা বন্ধ করিনি। এর কিছু প্রবন্ধ কলকাতার 'আলীপুর বার্তা—দেশলোক' পত্রিকাতেও সংশোধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠসমূহের সাধারণ সম্পাদক এবং গৌড়ীয় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সহযোগিতা ভিন্ন এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা কোনমতেই সম্ভব হ'ত না। নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও গৌড়ীয় সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি, শ্রীল প্রভুপাদ অনুকম্পিত, বহু বর্ষীয়ান, ক্ষুরধার স্মৃতিভাণ্ডারের অধিকারী শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ নিয়ত উৎসাহ ও আশিসবাণী দিয়েছেন। এ ছাড়া সর্বশ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ, ভক্তিবিকাশ সজ্জন মহারাজ, ভক্তিবিবেক বোধায়ন মহারাজ, ভক্তিহৃদয় বৈষ্ণব মহারাজ

এবং সর্বশ্রী কিরণচন্দ্র দাস (গুহ), অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, সুদর্শন দাস ও ভক্ত অঙ্গীরা (ইতালিয়ান) উৎসাহ দিয়ে ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহে সাহায্য করে ঋণী করেছেন। মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সারস্বত প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বিষ্ণু মহারাজ নিয়ত পরম যত্নে ও প্রচণ্ড পরিশ্রমে কার্য পরিচালনা না করলে ও প্রেস কর্মীদের সাগ্রহ সহযোগিতা না পেলে এত তাড়াতাড়ি পূর্ণাঙ্গভাবে এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বার্ধক্য ও পুনঃপুনঃ 'লোড-শেডিং'-র জন্য ছাপাখানার ভূতকে পুরোপুরি এড়ানো গেল না, বেশ কিছু ভুল এসে গেছে ; কিছু যৎসামান্য ও কিছু গুরুতর। যৎসামান্য ভুলগুলো পাঠক অনায়াসেই বুঝে নেবেন বলে সেগুলোর শুদ্ধিপত্র না দিয়ে কেবলমাত্র গুরুতর ভুলেরই দেওয়া হ'ল। ভূত ধরার মত, অসীম পরিশ্রমে এই ভুল ধরে দেওয়ার অসাধ্য সাধন করে বাধিত করেছেন শ্রীচৈতন্যমঠের সুখ্যাত 'মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট'-এর প্রধান শিক্ষক পরম প্রীতিভাজন শ্রীগৌরগোপাল সরকার, এম. এ (বাংলা), বি. টি।

যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে স্বর্ণখনিসম গ্রন্থ-সম্পদে পরিপূর্ণ কলকাতার শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগারটির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বান্ধব সমিতি পাঠ্য-পুস্তক গ্রন্থাগার (৬০ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৬), জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, শ্রীচৈতন্যমঠ গ্রন্থাগার (মায়াপুর), শ্রীগৌড়ীয় মিশন গ্রন্থাগার (বাগবাজার, কলকাতা) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখাসমূহের সেবায় লাগানোর সুযোগ পেয়ে লেখক ধন্য।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার
৭০ বি রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

—বি.এন. ভরদ্বাজ

গুণীজনের মতামত ঃ—

শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞানী আনন্দবাজার পত্রিকার সুখ্যাত প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর প্রয়াণের স্বল্পকাল পূর্বে 'গৌড়ীয়' পত্রিকা সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজকে ৯-৮-১৯৮৮ তারিখে লেখেন—

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

মহারাজ, আপনার সম্পাদনায় 'গৌড়ীয়' নামে যে বাংলা পত্রিকাটি প্রকাশ হইতেছে তাহা নিয়মিতভাবে পাইতেছি। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখাগুলি ভালো! আনন্দ এবং জ্ঞান দুইই পাওয়া যায়। আপনার গুরুবাদ সম্বন্ধে লেখাটি পড়িতেছি।

'অনাবিষ্কৃত কেদারনাথ' নামে যে লেখাটি ছাপা হইতেছে উহা খুবই মূল্যবান। আশা করি সম্পূর্ণ হইলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইবে। ইহা হইতে ধর্ম ও সমাজ দুই ইতিহাসই পাওয়া যাইবে। আমার একটি অনুরোধ আছে। লেখাটির মধ্যে অনেক পুরাণো পত্রিকার এবং মনীষীদের চিঠিপত্রের উল্লেখ করা হইতেছে। এইগুলি সাধারণের কাছে দুষ্প্রাপ্য। লেখাটি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তখন তাহার মধ্যে অথবা তাহার পরিশিষ্টরূপে ইহাতে উল্লিখিত পত্রিকার বিবরণসমূহ এবং মণীষীদের চিঠিপত্রসমূহ যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। ইহাতে সাধারণের এবং বিদ্বৎসমাজের প্রভূত উপকার হইবে। ১০ই ভাদ্র তারিখের পত্রিকাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্রের

উল্লেখ আছে* তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছি। আমার বিনীত প্রার্থনা আমার এই সামান্য অনুরোধটি আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

সুকবি, ছান্দসিক, সম্পাদক, বর্ষীয়ান রবীন্দ্র-গবেষক, বহু সমালোচনা গ্রন্থের লেখক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু—

'অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা কেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়বার সৌভাগ্য হ'ল। সৌভাগ্য বলার কারণ এই যে কেদারনাথ এমন একজন বিরল মনীষী যিনি উনবিংশ শতকের প্রাজ্ঞ প্রতিভাধর মনীষীদের সমকালে আবির্ভূত হয়ে এবং প্রজ্ঞা ও মনীষার উচ্চ মার্গে বিচরণ করেও পরবর্তী কালের কাছে অপরিচিত আছেন ; তাঁর সাহিত্যচিন্তা, রসরসিকতা, ধর্মপ্রবণতা—এক কথায় মনীষার পূর্ণ

---

*এ সম্বন্ধে কেদারনাথ তাঁর আত্মজীবন চরিত গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ১১১)— 'বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাকে এক বঙ্গভাষায় কবিতা লেখেন (১৮৬৩)। আমিও কবিতায় উত্তর দিই। পরস্পর উভয়ে অনেকগুলি কবিতা লেখা হইল। তন্মধ্যে দুইটি 'সন্ন্যাসী'তে ছাপা হইয়াছে (১৮৬৩)। আর সবগুলি কোথায় গেল পাওয়া যায় না।' — দুখের বিষয় এ পর্যন্ত চেষ্টা করে প্রথম সংস্করণ 'সন্নাসী' কাব্যগ্রন্থটী পাওয়া যায়নি এবং পরবর্তী সংস্করণ থেকে এই কবিতা পত্রগুলো বাদ দেওয়ায় সেগুলোর সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

—বি. এন. ভরদ্বাজ

পরিচয় এই আশু প্রকাশিতব্য গ্রন্থে পাওয়া গেল, এ বড় কম পাওনা নয়।

কেদারনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী এবং কর্মক্ষেত্রে উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কেদারনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদ্যতাও ছিল যথেষ্ট। কেদারনাথ ধর্ম, দর্শনের বিষয় নিয়ে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি মনোজ্ঞ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন, এই সব কবিতা পুস্তকের মধ্যে তাঁর 'বিজন গ্রাম' ১৮৫৭ সালে রচিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই কাব্যে কেদারনাথ প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন; এবং এই ছন্দ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্বস্থূরি কিংবা এই ছন্দের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বীজ নিহিত আছে—এ কথা বলতেই হবে।

কেদারনাথের ভাষা সরল এবং সুললিত, কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। তাঁর গদ্যের ভাষাও সরস, প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ। দুরূহ ধর্মকথা ও দার্শনিক তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি অতি সহজেই পাঠকের কাছে একেবারে সহৃদয় বন্ধু হিসেবে হাজির হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটিকে ত' উনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অনায়াসেই আখ্যাত করা যায়।

এ হেন কেদারনাথ কী করে অপরিচিত থেকে গেলেন—সেটাই আশ্চর্য। অথচ উনিশ শতকের সকল মনীষীবৃন্দই কেদারনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন,

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ সকলেই কেদারনাথের প্রতি মুগ্ধতার কথা বলেছেন।

এই অনাবিষ্কৃত মূল্যবান রত্নটি খুঁজে বের করে বাঙালী পাঠকের কাছে এনে লেখক সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। মহাশূন্যে সৌর-মণ্ডলের অজানা এক গ্রহ বা নক্ষত্রের আবিষ্কারের মতোই বাংলার সারস্বত মার্গের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে কেদারনাথের এই পরিচয় অভাবিত-পূর্ণ ও চমকপ্রদ। এ কাজ সম্পাদন করে লেখক বাংলার সারস্বত ক্ষেত্রে এক স্থায়ী প্রশংসার কাজ করলেন।

লেখকের নাম বি. এন. ভরদ্বাজ—তিনি যেই হোন, তিনি শুধু সাধক ও গবেষক নন, তিনি একজন সুলেখকও। যে সহজ ও সুরেলা গদ্যে তিনি কেদারনাথের সাহিত্য ও ধর্ম্মচিন্তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন—তা কোথাও একঘেয়ে ঠেকে নি, সর্বত্র রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে সাবলীল গতিতে এগিয়েছে, ফলে রস-সাহিত্য পাঠের আনন্দে পাঠক আপ্লুত হবেন।

ভরদ্বাজ মশাইকে শতকোটি ধন্যবাদ! যে রত্ন সম্পর্কে বাংলা-সাহিত্যের পণ্ডিত ইতিহাসকারেরা নীরব থেকেছেন বা তাঁদের জ্ঞানদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি—তাঁকে লোক সমক্ষে তুলে ধরার সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্যে ভরদ্বাজ মশাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

২৪. ৯. ৮৯

বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও সম্পাদক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় —

"সুপণ্ডিত বন্ধুবর বি. এন. ভরদ্বাজ একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন এবং সুহৃদ ছিলেন—কেদারনাথ দত্ত মহাশয়। 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি খ্যাত এই মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমকালীন এবং উভয়েই ছিলেন বৃত্তিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। 'অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা কেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)' নামক তথ্য সমৃদ্ধ রচনায় সেই অনাবিষ্কৃত মনীষীকে আবিষ্কার করেছেন শ্রীযুক্ত বি. এন. ভরদ্বাজ। এই তথ্য নির্ভর গবেষণা কর্মে তিনি যথেষ্ট স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দান করেছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কেদারনাথের প্রবহমান পয়ার ছন্দে রচিত 'বিজন গ্রাম' গ্রন্থটি এক হিসাবে পুনরাবিষ্কার বলা চলে এই আশ্চর্য গবেষণা কর্মের জন্য শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজকে অভিনন্দিত করি।"

ভবানী মুখোপাধ্যায়

২০।১১।১৯৮৯

রবীন্দ্র গবেষক প্রবীণ অধ্যাপক **ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়**—
"এ তো একটি অত্যাশ্চর্য কাজ হয়েছে। ডি-লিট্ পাওয়ার উপযুক্ত।"

বর্ষীয়ান সুখ্যাত তাত্ত্বিক ও সমালোচক অধ্যাপক **ডঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী**—

"আমি ছন্দের লোক নই, তবে কাজটি নিঃসন্দেহে খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে।"

হুগলী জেলার বিখ্যাত ইতিহাসকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান শ্রীসুধীরকুমার মিত্র—

'সংস্কৃতে একটি সুন্দর কথা আছে—"পুত্রে যশস্বী তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"। এ প্রবাদ সার্থক হয়েছে শ্রীকেদারনাথ পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর মধ্যে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে তথাপি এ যাবৎ কেদারনাথ দত্ত সম্বন্ধে অনেক জিনিষই অজানিত ছিল। অবশ্য, আনন্দের কথা এই যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছদ্মনামী লেখক অধ্যাপক বি. এন. ভরদ্বাজ অত্যন্ত পাকা হাতে কেদারনাথ দত্তের সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় সমাজ ও সাহিত্যে এই মহাপুরুষের অবদান যে কতখানি ছিল তা এই লেখকের অসীম পরিশ্রমের মারফৎ জেনে আজকের সমাজ ও সাহিত্য জগৎ অনেকখানি উপকৃত হবে। বাংলা কাব্যে প্রবহমান ছন্দে কেদারনাথই যে প্রথম রচয়িতা এ অজানিত সত্য প্রতিষ্ঠা করে লেখক সাহিত্য ইতিহাসের অনেকখানি মোড় ফিরিয়ে দিলেন।

কেদারনাথের বিশাল সংস্কৃত ও উল্লেখযোগ্য ইংরাজি সাহিত্যেরও মূল্যায়ন বর্তমান লেখক সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। শ্রীকেদারনাথ দত্তই ভক্তি ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তাঁর উপযুক্ত সন্তান প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পিতার ভক্তি জগৎকে উপযুক্ত শিষ্য সহযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবার কেদারনাথের সাহিত্য জগৎকেও উন্মোচিত ও যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন অধ্যাপক ভরদ্বাজ। তাঁর মঙ্গল হোক।

—সুধীরকুমার মিত্র

১৫.১২.৮৯

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যা আছে	যা হবে
৪	৯	মনীষীরা	মনীষী
	১২	কালিপ্রসন্ন	কালীপ্রসন্ন
৫	৬	রাঘাঘাট	রাণাঘাট
১৫	১৯	কৌতুহলাক্রান্ত	কৌতূহলাক্রান্ত
	২০	দুশ্চিন্তাগ্রস্থ	দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
২০	১	অনুদিত	অনুবাদিত
৩৮	১৬	দ্বন্দানল	দ্বন্দ্বানল
৫১	১৫	মুর্চ্ছিত	মূর্চ্ছিত
৫৯	৯	শুচিবায়ুগ্রস্থ	শুচিবায়ুগ্রস্ত
৬৯	১২	মস্বরামী	মস্করামী
৭৭	১৯	বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
১০১	৫	সত্বেও	সত্ত্বেও
১০৩	২০	পুনরোক্তি	পুনরুক্তি
১০৪	১০	বাহ্যস্ফুর্ত্তি	বাহ্যস্ফূর্ত্তি
১০৬	১৮	ঐশীক	ঐশিক
১১৩	২	দুঃস্প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য
১২৩	১৪	আয়ত্বের	আয়ত্তের
	১৭	অবতরণীকা'য়	অবতরণিকা'য়
১৭১	১০	ভগবত্তত্বের	ভগবত্তত্ত্বের
	২২	na	an

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যা আছে	যা হবে
১৭২	১৭	sittle	little
১৭৪	৭	ahd	had
	১৮	eontain	contain
১৭৯	১৫	exibited	exhibited
১৮৪	১৯	form	from
	”	descendat	descendant
১৮৭	১৮	Vlo.	Vol.
১৯২	১৫	knoledge	knowledge
১৯৫	৬	preaeher	preacher
২০০	১০	ধর্মতত্ব	ধর্মতত্ত্ব

কেদারনাথ দত্ত

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

—এক—

একটি অনাবিষ্কৃত সাহিত্য প্রতিভা

একটি জাতির জীবনে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ একাধিকবার ঘটতে পারে। বাংলায় এ ঘটনা অন্ততঃ ছ'বার যে ঘটেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই—একবার মহাপ্রভুর আবির্ভাবে ও আর একবার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রদূত ইংরাজের সংস্পর্শে। এর ফলে পরবর্তী অব্যবহিত কালকে স্থবর্ণযুগ বলা হয়েছে। যেমন মহাপ্রভুর প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দী ও পাশ্চাত্য প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দী। এই স্থবর্ণযুগের কাল উদ্ভাসিত হয়ে আছে বহু মনীষীর আবির্ভাবে ও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের বিশিষ্ট অবদানে। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য-পরিকর ষড়্‌গোস্বামি-গণ ছাড়াও বিশিষ্ট মহাজন পদকর্তাগণ ও শাক্ত-মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা বাংলার মানস ও ব্যবহারিক জগৎকে বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবিত করে গেছেন। মহাপ্রভুর সর্বপ্লাবী প্রভাব এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্ত রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকেও আপ্লুত করেছিল, যিনি তাঁর স্থবিখ্যাত মহাকাব্য-গ্রন্থ চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীচৈতন্য বন্দনা করে আরম্ভ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের বর্ণনায় সমাজ ও সাহিত্য ইতিহাস-বেত্তারা যে সমস্ত দিকপালের বিস্তারিত সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন তার

মধ্যে কোথাও কেদারনাথ দত্তের কথা নেই। এমনকি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণের বিবরণে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ ইত্যাদির কথা আলোচিত হলেও কেদারনাথ দত্তের কথা কেউই বলেননি। সামাজিক ক্ষেত্রে কেদারনাথ দত্ত ও ধর্মক্ষেত্রে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—একই ব্যক্তি হলেও, এঁদের রচনায় সম্পূর্ণভাবে অনালোচিত থেকে গেছেন।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনুগামী মহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি অতি পরিচিত, পরম শ্রদ্ধেয় ও পরম প্রিয় নাম। এ মহলে ওই শ্রদ্ধা শুধু ভক্তির পর্যায়ে পৌঁছানোর ফলে কেদারনাথ দত্তের বহুমুখী প্রতিভা এঁদের কাছেও প্রায় অজানিত রয়ে গেছে এবং যাঁরা কিছুটা জানেন তাঁরাও সেই প্রতিভাকে পূর্ণভাবে জানার ও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর বাইরের বিরাট জগতে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কো'ন চেষ্টাই করেননি। সর্বমোট ফল দাঁড়িয়েছে যে বাঙালীর মানস জগতে কেদারনাথ প্রায় অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছেন।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের যাঁদের অনেককে নিয়ে আমাদের এত গর্ব সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ মিত্র, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শিশিরকুমার ঘোষ ইত্যাদি কেদারনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে সপ্রশংস স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তবে আজ এ বিস্মৃতি কেন? সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইতিহাসবেত্তাদের কেদারনাথের উল্লেখে এ অনীহা কেন?

অবশ্য অন্যদিকেও যথেষ্ট শৈথিল্য আছে। অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকার কেদারনাথের আত্মজীবনী থেকে তাঁদের রচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য আত্মজীবনীটি দ্বিতীয়বার ছাপার কোন চেষ্টা হয়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গোষ্ঠী থেকে প্রকাশিত এ পর্যন্ত অত্যন্ত স্বল্প পরিসর তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়—পরমানন্দ বিদ্যারত্ন (পরে গিরি মহারাজ) রচিত 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' (জুন ১৯৭৬, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, ৬৪ পৃঃ), সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ' (২য় সং সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ঢাকা, ১৪+ ১১৬+১৬ পৃঃ) ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত 'Srila Thakur Bhaktivinode' (2nd Edn. Feb. 15, 1971, Mayapur, ii+22p)। এছাড়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের (১৯১৪, ২১শে জুন) পরের বছরে তাঁর আবির্ভাব তারিখে (১৮ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর-১৯১৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণে প্রদত্ত একটি সংক্ষিপ্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত জীবনী পাওয়া গেছে। এটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও পরম নির্ভরযোগ্য। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সজ্জনতোষণী পত্রিকা সম্পাদনায় কেদারনাথের সহযোগিতা করেছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

এ ছাড়া জীবনীর মালমসলা অধুনা দুষ্প্রাপ্য কেদারনাথ সম্পাদিত সজ্জনতোষণী (১ম পর্যায়) ও শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী (কেদারনাথের ৫ম পুত্র বিমলাপ্রসাদ দত্ত) সম্পাদিত সজ্জন-

তোষণী (২য় পর্যায়) এবং Harmonist, গৌড়ীয় (১ম পর্যায়), নদীয়াপ্রকাশ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

কেদারনাথের বিচিত্র প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য ব্যাপক একনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধকারের বার্ধক্যজনিত সীমিত ক্ষমতায় সেটা পূর্ণভাবে সম্ভব হবে না। এজন্য তরুণ গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে। তবু প্রাজ্ঞ ও ভক্তজনের দৃষ্টি আকর্ষণে এ নিবন্ধগ্রন্থের অবতারণা।

—দুই—

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঊনবিংশ শতকের সুবর্ণযুগের প্রথমার্ধের শেষদিকে কেদারনাথ দত্তের আগে ও পরে বহু আলোচিত যে সমস্ত মনীষীরা বাংলায় আবির্ভূত হন তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জুন ১৮৩৮), কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০), কালিপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭) ও রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮)। সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাসে কেদারনাথের মত দিক্‌পাল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অনাবিষ্কৃত ও অনালোচিত রয়ে গেছেন। তাঁর অপূর্ব মনীষার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাই এখানে কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করা হবে। কেদারনাথের আবির্ভাবের ১৫০ তম বর্ষ শুরু হয়েছে

গত ভাদ্রে (সেপ্টেম্বর ১৯৮৮)। যদিও পূর্ব উল্লিখিত কয়েকটি পুস্তিকায় তাঁর জীবনী দেওয়া আছে, তথাপি সেখানে কিছু ফাঁক ও ত্রুটি আছে বলে খুবই সংক্ষেপে একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী এখানে দেওয়া হ'ল।

আন্দুলরাজ কৃষ্ণানন্দ দত্তের সম্পর্কিত বালী সমাজান্তর্গত সুপরিচিত হাটখোলার দত্ত বংশে আনন্দচন্দ্র দত্তের তৃতীয় পুত্র কেদারনাথ, মাতামহ ধনাঢ্য ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফীর নদীয়া জেলার রাঘাঘাট থানার অধীনে বীরনগর মৌজার (জে, এল, নং ১৯) উলা গ্রামের বাড়ীতে ৩৫৩ চৈতন্যাব্দের ২৮ হৃষীকেশ, বাংলা ১২৪৫ সনের ১৮ই ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে (ইংরাজি ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার) জন্মগ্রহণ করেন।

আত্মজীবনচরিতে তিনি তাঁর জন্মকোষ্ঠীর ছকটি নিম্নলিখিতভাবে দিয়েছেন এবং লিখেছেন—'আমি ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র তারিখে··· জন্মিয়াছিলাম' (পৃঃ ২) ঃ—

রা ২৬
ম ৭ শু ৯
চ ২২
র ১১
ল
বু ১২
কে ১১
শ ১৬

জাতাহঃ।

দিনমান ৩১।১৪।৪৮

১	২২	৫
১৩	২৫	৮
২৬	১১	৪০
৪১	৪	১৮

শিক্ষা শুরু হয় মাতামহ স্থাপিত গ্রামের পাঠশালায়। সাত বছর বয়সে নতুন স্থাপিত কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, রামতনু লাহিড়ী ও ডিজার বারেটের কাছে শিক্ষা লাভ হয়। মাতামহের মৃত্যুর পর মেশোমশায় ইংরাজি ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের হেদুয়ার ধারের বিশাল বাড়ীতে রেখে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি করে দেন। সেখানে দু'বছরে স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে (১৮৫৪) কেদারনাথ আরও দু'বছর হিন্দু কলেজে পড়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন (১৮৫৬)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৫৭-র জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৮তে বি, এ, পরীক্ষা দেন ১৩ জন ও সকলেই ফেল করেন। ৭ নম্বর 'গ্রেস' দেওয়ায় যে দুজন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হন তাঁরা হলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু (Cal. Univ. Minutes for the year 1858, pp. 18-19 *vide* বঙ্কিম রচনাবলী ১ম, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা পৃঃ ১২)। তখন কলেজে চার বছর পড়ে তবেই বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া যেত। কলেজের প্রথম দু'বছরকে First Arts (F. A.) বলা হ'ত। প্রথম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা (I. A. & I. Sc.) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয় ১৮৬১ তে।

হিন্দু কলেজে কেদারনাথ স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কেদারনাথের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল ও তারকনাথ পালিত এবং পরের শ্রেণীতে পড়তেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯৩৫) ও কেশবচন্দ্র সেন। এঁদের সঙ্গে তিনি নিত্যই

ইংরাজিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, মেটকাফ হল ইত্যাদি স্থানে সাহিত্য ও তর্কসভায় যোগ দিতেন। সেখানে বহু গণ্যমান্য ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে মেটকাফ হলের গ্রন্থাগারিক শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ মিত্র, রেভারেণ্ড ডাল সাহেব, অধ্যাপক জর্জ টমসন, ডঃ এস, ডাফ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন, ও তাঁর বাগ্মীতার ও যুক্তির প্রশংসা করতেন। এসময় তাঁর ইংরাজি ও বাংলায় অনেক কবিতা ও গুরুতর প্রবন্ধ Literary Gazette, Hindu Intelligencer প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ইংরাজ ও বাঙালী বিদ্বজ্জনসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে (১৮৫৫--৫৬)।

ইতিমধ্যে ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হ'লে (১৮৪৯) মায়ের ইচ্ছায় পরের বছর রাণাঘাটের মধুসূদন মিত্রের পাঁচ বছর বয়সের কন্যা সয়ামণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (১৮৫০)। কিন্তু বাল্যবয়স থেকেই তাঁর ধর্ম-দর্শনের ক্ষুধা অত্যন্ত তীব্র ছিল। যে 'হরিকথা' শব্দটি আজ বৈষ্ণব সমাজে অতি প্রিয়, তিনি এই নামেই মাত্র ১২ বছর বয়সে কাব্যে ছোট একটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ও বন্ধু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বহু সময় নিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ধর্মদর্শনের আলোচনা করতেন। তিনি লিখেছেন,—'আমি ব্রাহ্মদিগের পুস্তকাদি পড়িয়াছিলাম। ......পাদ্রী ডাল সাহেবের নির্দেশমত বাইবেল ও নানাবিধ খৃষ্টীয় গ্রন্থ পড়ি। রামমোহন রায়ের পাদ্রীদের সহিত বিতর্ক বিবরণ পাঠ করি। ...সেলের কোরাণ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম' (আত্মজীবনচরিত, ৮০পৃঃ)। তথাপি কোন অবস্থায় কিন্তু নিজের স্বাধীন বিবেচনা বিসর্জন দেননি।

বাল্য-কৈশোরের এই মনোভাবই তাঁকে পরবর্তী জীবনে নির্ভীক মনুষ্যত্ব-ভিত্তিক ধর্মযোদ্ধা করে তুলেছিল। প্রৌঢ় বয়সেই (১৮৮০) কেদারনাথ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আদর্শে শ্রীজাহ্নবাশাখায় পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সহিত্যজীবনে তাঁর কৃতি রচনাগুলি আজকের দিনের আলোকপ্রাপ্ত সমাজ ও সমালোচকদের দৃষ্টি নেপথ্যে রয়ে গেছে। সংক্ষেপে রচনাগুলি হ'ল প্রবহমান ছন্দে 'বিজনগ্রাম' (১৮৫৭, ছাপা হয় ১৮৬২), 'সন্ন্যাসী' কাব্য (১৮৬৩), ইংরাজিতে 'পোরিয়েড' কাব্য (১৮৫৬) এবং অন্যান্য কবিতা ও প্রবন্ধ (১৮৫৬-৬০) । অত্যন্ত অল্পবয়সেই অভাবের তাড়নায় গভীরভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে না হ'লে হয়ত বাংলা সাহিত্য তাঁর দানে আরও পুষ্ট হ'তে পারতো। অবশ্য ধর্ম-সাহিত্যে পরিণত বয়সে তাঁর যে সুমহান ও সুবিশাল রচনা তার তুলনা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে আর নেই। আবার বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাঁর সম্পাদনায় 'সজ্জনতোষণী' (১৮৮১-১৯১৪) একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। সে যুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর সুললিত ভাবানুগ ও সহজ গদ্যভাষা আজকের পাঠককেও সমানভাবে আকর্ষণ করে ও আনন্দ দেয়। তাঁর 'জৈবধর্ম' (১৮৯২-৯৮) ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য (১৮৮০-৮১, ১৮৯০-৯২) অত্যন্ত জটিল বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ও ভাবপ্রকাশের সারল্যের জন্য আপামর পাঠক সাধারণকে মুগ্ধ করে আসছে।

কেদারনাথের কর্মজীবন অতিব্যস্ত ও প্রায় ভ্রাম্যমাণ ছিল, তথাপি তিনি তাঁর গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্যে অবহেলা করেননি। তাঁর পুত্র-কন্যা সুলালিত, সুশিক্ষিত, এমন কি কেউ কেউ সুখ্যাতও হয়েছিলেন।
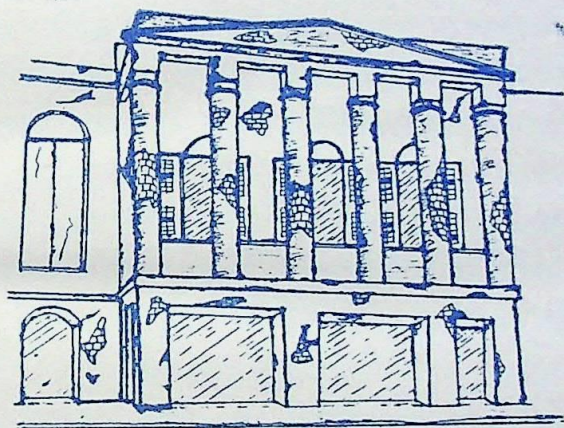
হেদুয়ার (আজাদ হিন্দ্ বাগ) ধারে কাশীপ্রসাদ ঘোষের গৃহ। কেদারনাথের কলকাতায় শিক্ষাজীবন এখানেই অতিবাহিত হয় (১৮৫০-১৮৫৭)। গৃহটির এখন ভগ্নপ্রায় অবস্থা।

বাল
ভিবি
শ্রীর
গ্রহ

সম
হ'
ক
ক
গ

২২ বছর বয়সে তাঁর ও পঞ্চদশবর্ষীয়া পত্নীর সন্তান হিসাবে অন্নদাপ্রসাদ (অচ্যুতানন্দ) জন্মগ্রহণ করে (১৮৬০)। কিন্তু শিশুর দশমাস বয়সে তার মাতার মৃত্যুতে কেদারনাথ অগত্যা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন মেদিনীপুর জেলার যকপুরের পীতাম্বর নাগের কন্যা ভগবতী দেবীকে এবং ঐ শিশু পিতামহী ও বিমাতার কোলে মানুষ হয়। ভগবতী দেবী ও কেদারনাথের ছিল আটটি পুত্র—রাধিকাপ্রসাদ (১৮৭০), কমলাপ্রসাদ (১৮৭২), বিমলাপ্রসাদ (শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী, ১৮৭৪), বরদাপ্রসাদ (১৮৭৭), বিরজাপ্রসাদ (১৮৭৮), ললিতাপ্রসাদ (ললিতাঠাকুর, ১৮৮০) ও শৈলজাপ্রসাদ (১৮৯২) এবং পাঁচটি কন্যা সৌদামিনি (১৮৬৪), কাদম্বিনী (১৮৬৬), কৃষ্ণবিনোদিনী (১৮৮৪), শ্যামসরোজিনী (১৮৮৬) ও হরিপ্রমোদিনী (১৮৮৮)। কেদারনাথের দ্বিতীয় পুত্রটি (৪র্থ সন্তান) জন্মের এক-মাস পরে মারা যায় (১৮৬৮)।

কুড়ি বছর বয়সেই কেদারনাথের কর্মজীবন শুরু হয় উড়িষ্যায় শিক্ষকতা দিয়ে। সেখানে প্রথমে কেন্দ্রপাড়ায় তাঁর শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্তরিক সাহায্যে ও প্রভাবে একটি সরকারী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন (১৮৫৮)। এর পরে পুরীতে শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রথম কটকে, মাঝে ভদ্রকে ও পরে মেদিনীপুরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেন। মেদিনীপুর স্কুলে শিক্ষক রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। ১৮৬১ সালে কিন্তু শিক্ষকতা ছেড়ে বর্ধমান জজ-কোর্টের নাজিরের পদ নেন। ১৮৬৬ সাল থেকে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও

ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়ে একেবারে কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত (১৮৯৪) ওই পদে থাকেন। প্রথম নিয়োগ ছাপরা সদর মহকুমা নিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ১৮টি মহকুমায় পর্যায়ক্রমে নিযুক্ত হন, তবে এর মধ্যে দিনাজপুর, কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান মহকুমায় দুবার করে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শিক্ষকতার মত এই প্রশাসনিক কাজেও তিনি চূড়ান্ত দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এবং অভাবিতভাবে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' শুধু কথায় নয় কাজেও পরিণত করেছিলেন। ১৮৭০-৭২ সালে জনপ্রতারক বিষকিষণের অবতারিত্ব ঘুচিয়ে তাকে জেলে পুরেছিলেন।

গবেষণা ক্ষেত্রেও কেদারনাথের দান অনবদ্য। সেকালে এখনকার মত এত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষক ছিলেন না। বহু ক্ষেত্রে প্রশাসকদেরই স্থানীয় সমস্যার বিশ্লেষণ করে সমাধান নির্দেশ করতে হ'ত। এঁদের অনেকের এসব বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা পুস্তক আকারে থেকে আজকের গবেষকদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করছে। কেদারনাথ ভদ্রকে শিক্ষকতাকালে উড়িষ্যার মঠগুলোর ভেতরের গ্লানির যে বিবরণ তাঁর Maths of Orissa গ্রন্থে দিয়েছিলেন (১৮৬০) সেটাই পরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের গবেষণায় সহায় ও প্রশংসার কারণ হয়েছিল (Imperial Gazetteer, pp. 118 -119 of 'Orissa', Vol. I, 1872)। কিন্তু কেদারনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা ও আবিষ্কার—শ্রীচৈতন্যের নির্মল বৈষ্ণবতত্ত্বের নবদ্বীপ সমাজে সহজিয়াপঙ্কে নিমজ্জনের উপলব্ধি ও উদ্ধার প্রচেষ্টা এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুরের আবিষ্কার। এর জন্য তিনি আপ্রাণ

চেষ্টায় চাকুরীর বিষম কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গভীরভাবে শাস্ত্রান্বেষণ, প্রমাণ সংগ্রহ, গুণীজনের সঙ্গে আলোচনা ও বক্তৃতা-কীর্তনের জন্য 'নামহট্ট' ও 'ভক্তি-আসন'-এর মাধ্যমে লোকচেতনা গড়ে তুলতে যে পরিশ্রম করেছেন তা আজকের বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদেরও শ্রদ্ধা বিস্ময়ে হতবাক করে দেবার মত। প্রশংসাও তিনি পেয়েছিলেন প্রকৃত সুধীজনের কাছ থেকে। ১৮৮৬ সালে অম্বিকা-কালনার বৈষ্ণব পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'ভক্তিবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করে ধন্য হলেন; আর ঐ বছরেই তাঁকে লণ্ডনের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি' মেম্বার বা সদস্য করে নিল (MRAS)। গান্ধীজি যেমন তাঁর জীবদ্দশাতেই কেবল 'মহাত্মাজি' হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনই তাঁর অনেক আগে কেদারনাথ লোক-শ্রদ্ধায় কেবলমাত্র 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' হয়ে গেলেন।

১৮৯৪ তে কৃষ্ণনগরে একটি বিরাট গুণীজনের সভায় তিনি গবেষণা ও মায়াপুর আবিষ্কারের কথা 'নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)'-র মধ্য দিয়ে পেশ করলেন। বিপুল সমর্থনের মধ্যে গঠিত হ'ল 'শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা', যার ওপর ভার দেওয়া হ'ল মহাপ্রভুর জন্মভিটাকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার। তাঁকে করা হ'ল কার্যপতি। ঐ বছরেই তিনি অকালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত প্রচণ্ড পরিশ্রমে মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে উদ্ধার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। করলেন মহাপ্রভুর নির্মল তত্ত্বকে সহজিয়া পঙ্ক থেকে উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা—বহু তত্ত্বগ্রন্থ রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ষকে গ্রন্থিত করলেন

গোদ্রুমচন্দ্রাব্দের প্রচলন করে (বাংলা বৈশাখ-চৈত্র অনুযায়ী) ১৮৮০ সালে।

এরপর স্থির করলেন যে তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ হয়েছে। আকুমার ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিত পঞ্চম পুত্র বিমলাপ্রসাদের হাতে তুলে দিলেন রক্ষণাবেক্ষণ ও আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার। সব ছেড়ে দিয়ে স্বরূপগঞ্জে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে আপন 'সুরভি কুঞ্জ' কুটীর নির্মাণ করে পরম নিজজনের আরাধনায় নিত্যমগ্ন থেকে ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন রবিবার, ৯ই আষাঢ় ১৩২১ সনের অমাবস্যা তিথিতে কলকাতায় 'ভক্তিভবনে' (১৮১ নং মানিকতলা স্ট্রীটে) এই মহান ভক্ত মরজগতের কাছে অপ্রকট হলেন।
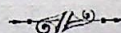
—তিন—

বহুমুখী প্রতিভা

কেদারনাথ দত্তের বহুমুখী প্রতিভার যে দিকটি সর্বাপেক্ষা অনালোচিত থেকে গেছে সেটি হল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। এর প্রধান কারণ তাঁর ধর্মমুখী মন তাঁকে প্রচলিত প্রেমকাহিনী (উপন্যাস ও কাব্য) রচনায় প্রেরণা দেয়নি। কিন্তু মন তাঁর ছিল রসপিপাসু ও আবাল্য সন্ধানী। তাই যখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ সর্বমানবিক উদার ভক্তিরসের সন্ধান পেলেন, তাতেই একেবারে মজে গেলেন এবং শিক্ষিত

রুচিবান জগৎকেও মাতিয়ে তুললেন। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে এক মুহূর্তের জন্যও বাস্তবতাকে হারিয়ে তিনি আবিলতা ও কপটতাকে প্রশ্রয় দেন নি, বরং সদাই তীক্ষ্ণভাবে এদের আঘাত করেছেন, যেমন—'বাউল, সাঁই, নেড়া (সহজিয়া), দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে সকল মত আছে সে সমুদয়ই অবৈষ্ণব মত। তাহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্মধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না' (প্রেম প্রদীপ, পৃঃ৬৭)। অথবা,—'হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ······পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য' (সজ্জনতোষণী, ১৮৯৬, ৮ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ২৫২)।

তিনি লোকদেখানো ভক্তির স্বরূপ তুলে ধরে বলেছেন—'আজকাল অনেকগুলি লোক···প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই···ভক্তদিগের নিকট ভক্তি-ভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠালাভের লোভে এবং অন্যস্থলে প্রাপ্তি লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন' (স, তো, ১৮৯৭, ৮।১০।২৯৮)। আবার, বৈষ্ণবতা ও পরমার্থ ধর্ম যে বংশগত সম্পত্তি নয় সে কথাও জোরের সঙ্গে বলেছেন যেমন—'পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। ···বৈষ্ণববংশ বলিয়া কথা হইতে পারে না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে

বৈষ্ণব ধর্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতাই ইহার মূল' (স, তো, ১৮৯৮, ৯।৯।২।)

যদিও তিনি বিশেষ অর্থে বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যেমন—'বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। তবে কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় হইবে না। বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞানসংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত, (স, তো, ১৮৪, ২।১১৩)। তথাপি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ প্রেম-ভক্তিধর্মকে সহজিয়া-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে এতই নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রতিভা থাকা সত্বেও তাঁর বিনোদন-সাহিত্য রচনার না ছিল অবসর, না কোন প্রবৃত্তি। ফলে বিনোদন-সাহিত্য পাঠকদের বিশাল মহলে তিনি রয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত। কিন্তু ধর্ম দর্শনের অদম্য আকর্ষণে তারুণ্যের উষাকাল থেকেই তাঁর জিহ্বা ও লেখনী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সদা ব্যস্ত থাকলেও স্বাভাবিক সাহিত্য প্রতিভা যেন তাঁর অজান্তেই তাঁকে দিয়ে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রসঘন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়ে নিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্যেও তাঁর বিশাল দান ঐ গোষ্ঠীর ধর্মপিপাসুদের মধ্যেই কেবলমাত্র বিশেষভাবে আগ্রহশীল পাঠক পেয়েছে। যাঁর ফলে একদিকে বিশাল বিনোদন-সাহিত্য পিপাসু গোষ্ঠীর মধ্যে ও অপরদিকে প্রচারপ্রতিষ্ঠিত অন্য ধর্ম-সাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে কেদারনাথ অথবা 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' প্রায় অজানিত থেকে যাওয়ায়, সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাসবেত্তারা

তাঁর সন্ধান পান নি, বা তাঁদের রচনায় একবার তাঁর নামোল্লেখেরও প্রয়োজন বোধ করেন নি। নেড়ানেড়িদের হাত থেকে উদ্ধার করে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি ধর্মের নবপ্রবর্তক হিসাবেও তাঁর নাম উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

লোকরঞ্জনী সাহিত্য সৃষ্টি না করেও কেদারনাথ যেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তেমনি ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়েও তাঁর দান নগণ্য নয়। বাংলা কাব্যে প্রবহমান ছন্দের পরীক্ষা তিনিই প্রথম করেন (১৮৫৭)। আর, গদ্যে সাধু ক্রিয়া-সর্বনামের নির্ভুল কাঠামোতে তাঁর রচনাকে বেঁধে রাখলেও, কি বর্ণনায়, কি কথোপকথনে, তিনি সমাসবদ্ধ তৎসমপ্রধান শব্দপ্রয়োগ সমসাময়িক অন্য রচয়িতাদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম রেখেছেন এবং তৎভব ও দেশজ শব্দের পরিমাণ বেশী দিয়েছেন বলে, তাঁর ভাষা সাধারণের কাছে অনেক বেশী সহজ ও প্রাণের ভাষা হয়ে উঠেছে। এসব সম্বন্ধে সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনামূলক উদাহরণ যোগে পরের কয়েকটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

কেদারনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে গৌড়ীয় পত্রিকায় বর্তমান লেখক কর্তৃক ধারাবাহিক আলোচনা বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহিত্য-বিভাগে বেশ কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু মন কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে যোগাযোগ করেছেন, আরও জানার আগ্রহে। কিন্তু কিছু সাহিত্য-সমাজ ইতিহাসবেত্তা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছেন এই ভেবে যে তাঁদের রচনায় কেদারনাথের মত আরও কোন কোন সাহিত্যরথী বাদ পড়ে গেছেন কিনা। একজন মধ্যবয়সী গবেষণা সহায়ক বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক গবেষণা ইচ্ছুক শিষ্যকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন এই বলে—'কেদারনাথের নাম কখনো শুনিনি, কি দরকার অজানাকে নিয়ে চর্চা করার, তার চেয়ে কোন চেনা জানা লেখককে নিয়ে কাজ করো।' কি আশ্চর্য! অজানাকে আবিষ্কারের ও জানার চেষ্টাই ত গবেষণা। এক্ষেত্রে ত আগ্রহ করে বলা উচিত ছিল—'তাই নাকি, শুনিনি ত, এঁর সম্বন্ধে যা জানতে পারছো সব নিয়ে এসো ত দেখি'। তবে মূল প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—কেদারনাথ কি তাঁর কালে এতই অজানিত ছিলেন? কিন্তু তথ্য সন্ধানে ত অন্য চিত্রই পাওয়া যাচ্ছে। কেদারনাথ শুধু যে প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিচিত ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর কালে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বাগ্মী ও সম্পাদক হিসাবে রীতিমত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

ছাত্রজীবনে হিন্দু কলেজে পঠনকালেই তাঁর রচনার ও বাগ্মীতার খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন, তারকনাথ পালিত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল ইত্যাদি সহপাঠীরা কেদার-নাথের রচনার ও বাগ্মীতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁর স্থাপিত 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'তে কেদারনাথকে একটি বিশিষ্ট সভ্য করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রায়ই সোসাইটির সভায় দর্শন ও ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করতেন। ঐ সভায় বিশিষ্ট ভারতীয় ও য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণ ও পাদ্রীগণ উপস্থিত থাকতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কবিরাজ গঙ্গাগোবিন্দ সেন, প্যারীচরণ মিত্র, জর্জ টমসন, পাদ্রী ডাল্‌সাহেব ও কেদার-সহাধ্যায়ীরা ('হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' ১৮৫৫-৫৮)। 'মেট্‌কাফ হল'-এর গ্রন্থাগারিক প্যারীচরণ মিত্র ঐ হলে বিশিষ্ট ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বিদ্বজ্জন সমাবেশে কেদারনাথের বেশ কিছু

বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন ('লাইব্রেরী গেজেট' ১৮৫৬-৬০)। মেট্‌কাফ হলের গ্রন্থাগার পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (১৯০৩) ও আরও পরে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয় (১৯৪৮)।

এসব বক্তৃতাদি সম্বন্ধে কেদারনাথ নিজেই লিখেছেন—'তারকনাথ পালিত আমার সতীর্থ, বন্ধু ছিলেন। তখনও তিনি বিলাত যান নাই। আমার (তত্ত্ববিদ্যার) বিচারে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্তাব করত আমাকে একদিন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা করাইলেন। উপস্থিত সাহেবগণ বলিলেন যে, আমার বিচার গম্ভীর হইয়াছে। ...সেই সভার আর এক অধিবেশনে আমি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইংরাজিতে নাটকাকারে রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। সেদিন বড় বিতর্ক হইল' (আত্মজীবনচরিত, পৃঃ ৯)।

সহপাঠি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেদারনাথ প্রায়ই জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যেতেন এবং সামান্য বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও দ্বিজেন্দ্র-নাথকে সত্যেন্দ্রনাথের মত 'বড়দাদা' বলতেন। তিনি লিখেছেন—'সন্ধ্যার পর অনেক দিবসই আমি যোড়াশাঁকো শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে বসিতাম। ...যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়বন্ধু থাকেন, তবে বড়দাদাই আমার হৃদয়বন্ধু। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। ...কাণ্ট, গোএটী, হিজেল, সুইডেন-বর্গ, স্কুপেনহুয়ার, হিউম, ভলটেয়ার, কুজো প্রভৃতি অনেক লেখকদিগের পুস্তক আলোচনা করিয়া...আমার যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা বড়দাদা শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ভাই তুমি গভীর রূপে চিন্তা

করিয়াছ। আমি তোমাকে হটাইতে পারিতেছি না"।' (আত্ম-জীবনচরিত, পৃঃ ৭৮-৭৯)।

উপর্যুপরি বিভিন্ন ধনবান আত্মীয় ও পরিজন বিয়োগে কেদারনাথ রীতিমত অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে বি, এ, পরীক্ষা না দিয়েই শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুপারিশপত্র নিয়ে উড়িষ্যার শিক্ষাক্ষেত্রে কর্ম-সন্ধানে যান। ঈশ্বরচন্দ্র উড়িষ্যার তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকারিক ডঃ রোয়ার সাহেবকে লেখেন (১৮৫৬)—'অ্যমার একটি ছাত্র কার্য্য -উপলক্ষ্যে উৎকলদেশে যাইতেছেন, শিক্ষাবিভাগে তাঁহার একটি চাকুরী হইলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হয়। যদিও এই পত্রবাহক অতি সম্মানিত ধনবানের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি কালবশে তাঁহার সম্প্রতি পরসেবা না করিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে' (গৌড়ীয়, ১৯৩২, ১০।৩৮।৫৯৫-৯৯)। বিদ্যাসাগরের পত্র নিয়ে কেদারনাথ রোয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বেদারনাথের ইংরাজি জ্ঞানের গভীরতা দেখে এতই মুগ্ধ হন যে বিদ্যাসাগরের সুপারিশ অনুযায়ী উড়িষ্যায় ইংরাজি শিক্ষা প্রসার কল্পে কেন্দ্রপাড়ায় একটি বিদ্যালয়কে সরকারী উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে কেদার-নাথকে ইংরাজি শেখানোর ভার দিলেন। ছাত্রের যোগ্যতা ও অভি-নিবেশের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই বিদ্যাসাগর অত জোর দিয়ে সুপারিশ করেছিলেন। কেদারনাথও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আস্থার পূর্ণ মর্যাদা অতি সুখ্যাতির সঙ্গে দিয়েছিলেন। মাত্র সুপারিশ লিখে দিয়েই বিদ্যাসাগর এই বিশিষ্ট ছাত্রটিকে ভুলে যাননি। তাঁর উপদেশেই পরে

কেদারনাথ পুরীতে এসে শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে পাকা চাকুরী পান।

কেদারনাথ ভদ্রকে শিক্ষকতাকালে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের ইতিবৃত্ত ও তদানীন্তন পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণামূলক Maths of Orissa নামক যে পুস্তিকা লেখেন তার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের সপ্রশংস উল্লেখে কেদারনাথকে ব্রিটেনের 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র মেম্বার করা হয়। এ সংবাদ সে কালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৬)। (স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের মন্তব্য—অধ্যায় 'তেরো' দ্রষ্টব্য)।

তরুণ কেদারনাথ মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে শিক্ষকতাকালে (১৮৬০-৬১) খ্যাতনামা প্রবীন শিক্ষক রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে অনেক ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করত। আবার কেদারনাথের প্রভাবে কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্মকে নীরস ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় বৈষ্ণবধর্মকে শ্রেয় মনে করতে লাগল। পরোক্ষে কিছুটা দলাদলিভাব গড়ে উঠলেও, একটি সাহিত্যসভায় তরুণ কেদার-নাথের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে রাজনারায়ণ বসু তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তিনি যে অনেক উচ্চ মর্যাদার যোগ্য তা অকপটে প্রকাশ করেন (গৌড়ীয়, ১০।৩৮।৫৯৫-৯৯)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে যখন যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় নিয়োগ পেয়ে আসেন (১৮৬৬) তখন কেদারনাথ বিদায়ী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁকে কাজ বুঝিয়ে দেন। দুজনে এ সময়ে কয়েকদিন একসঙ্গে থাকেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সম্বন্ধে লেখার আগ্রহ জেনে কেদারনাথ তাঁকে স্ব-অনুদিত 'রসিকরঞ্জন টীকা' সমেত এক কপি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' (সারার্থ-বর্ষিণী টীকা সহ) উপহার দেন। এ বিষয়ে দুজনে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'র ভূমিকায় লিখেছেন—'...পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ....ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী।'

কেদারনাথের অন্যতম বিরাট কীর্তি নদীয়া জেলার মায়াপুরে প্রাচীন নবদ্বীপধামে শ্রীল রূপগোস্বামী বর্ণিত বল্লালদীঘির পাড়ে এবং স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের Statistical Account of Bengal-এ ডঃ ব্লশম্যান উল্লিখিত কাজির সমাধি ও বল্লাল ঢিপির নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের আবিষ্কার। তিনিই প্রথম কৃষ্ণনগর কাছারিতে লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর রাজস্ব-সচিব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তৈরী নদীয়া জেলার দেওয়ানী নক্সায় (১৭৭৩) মায়াপুরের উল্লেখ আবিষ্কার করেন (১৮৯০)। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ও মায়াপুরের প্রতিষ্ঠার ফলেই আজ বহু মঠের নগরী মায়াপুরের খ্যাতির ও ISKCON ইত্যাদির জগৎব্যাপী প্রসার হয়েছে। অবশ্য মায়াপুরের খ্যাতি ও উন্নতির জন্য বর্তমান সহর নবদ্বীপের বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভাতে হাত পড়ে, যার ফলে সেখানকার মহান্তদের অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ও মায়াপুরের বিরুদ্ধে সোচ্চারভাবে অপপ্রচার শুরু করে দেন।

কেদারনাথ সেকালে একদিকে যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন—'আহা!

যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন,—সেদিন কবে হইবে!' (স, তো, ১৮৯১, ৪।৩)।

অপরদিকে পরে মায়াপুর প্রতিষ্ঠায় নবদ্বীপে বিরোধিতার ঝড় ওঠা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। ... কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা... কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন। তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন (আত্মজীবনচরিত, পৃঃ ২০১)।

এ পর্যন্ত উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে তাঁর কালে কেদারনাথ আদৌ অজানিত ছিলেন না, বরং তাঁর খ্যাতি দেশে বিদেশে প্রচারিত ছিল। তাঁর তিরোধানের পর কয়েক বছর ধরে পুনঃ পুনঃ দেশে বিদগ্ধ সমাজ যেভাবে তাঁর যশোগান, সাহিত্যকীর্তির গুণগান ও তাঁর অভাবের জন্য শোকপ্রকাশ করেছিলেন তা নিতান্তই অভাবনীয় ও তুলনাহীন। এ সময় অবশ্য 'কেদারনাথ' নাম হারিয়ে গিয়ে তিনি জনসমাজে কেবলমাত্র 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' নামেই সুপরিচিত ছিলেন।

কেদারনাথের তিরোধানের পরের বছরের জন্ম তারিখে (১৮ই ভাদ্র

১৩২২, সেপ্টেম্বর ১৯১৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে যে মহতী সভা হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কেদারনাথের সজ্জনতোষণী পত্রিকার সহকর্মী সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এবং আরও অনেকে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মূল লক্ষ্য ছিল—সাহিত্যের দ্বারা ভগবানের সর্ব্বতোমুখি সেবা··· । শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থরচনাই যেমন তাঁহাদের ভজন, জপ, তপ, সিদ্ধি ছিল, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থরচনা-কার্য্যও ঠিক সেইরূপ ছিল।' সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—'ঠাকুর ইংরেজি-সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াও···সুবিস্তৃত ভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া দিয়াছেন।···এই ভক্তি সাহিত্যই আমাদের নিজস্ব সাহিত্য।' মতিলাল ঘোষ—'আমার দাদা শিশিরকুমার ঘোষ অনেক সময় ঠাকুরের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি ঠাকুরকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।' (স, তো, ২য় পর্যায়, ১৮শ বর্ষ-১৯১৫ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা। পরিশিষ্টে মহাত্মা শিশির ঘোষের পত্র দ্রষ্টব্য)।

পর বৎসর (১৮ই ভাদ্র ১৩২৩, সেপ্টেম্বর ১৯১৬) কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে একটি বিরাট সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

অন্যান্য বক্তারা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, বিপিনচন্দ্র পাল, সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সভায় বলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত বর্ষ পূর্বে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কালবশে তাহাতে অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কিন্তু এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে সেই বৈষ্ণবধর্মের সত্য-বাণী দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তখন ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থাকারে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।' বিপিনচন্দ্র পাল বলেন—'শ্রীভক্তি-বিনোদের 'কৃষ্ণসংহিতা' পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার তুল্য সিদ্ধান্ত আর নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয় চারিশত বৎসর পূর্বের প্রচারিত ধর্মকে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন।' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভক্তিবিনোদের পুস্তকগুলি পড়িলে বা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইনি কি জন্য জগতে আসিয়াছিলেন; সাহিত্যরাজ্যে, ভাব-রাজ্যে ও রস-রাজ্যে ইঁহার স্থান কোথায়। তাঁহার প্রবন্ধগুলি যখন প্রকাশিত হইত, তখন মনে হইত যেন কোথা হইতে তড়িদালোক প্রকটিত হইতেছে।' (স, তো, ১৯১৬, ২য় পর্যায়, ১৯শ বর্ষ)

১৮ই ভাদ্র ১৩২৫ (সেপ্টেম্বর ১৯১৮) থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি হলে বিদগ্ধ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রেজিষ্ট্রার জেনারেল রায়বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন—'বৈষ্ণবধর্ম বলিতে একমাত্র সার্ব্বজনীন

ধর্মকে বুঝায়। আমরা মূল-প্রীতিসূত্র ভুলিয়া গিয়াছি।…তিনি বর্তমান শিক্ষিত-সমাজে ইহা নানাভাবে দেখাইয়া আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। (স, তো, ১৯১৮, ২য় পর্যায়, ২১ বর্ষ)। উপরোক্ত তিনটী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারেই ১ সেট করে ৩৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ভক্তিবিনোদ রচনাবলী' উপহার দেওয়া হয় (পরিশিষ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar এর পত্র দ্রষ্টব্য)।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাতঃস্মরণীয় গবেষক ও বিখ্যাত বঙ্গীয় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন (১৯৫২)—৩০৪। সজ্জনতোষণী (মাসিক): বৈশাখ ১২৮৮। বৈষ্ণব পত্রিকা। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে (মাঘ ১২৯০) ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—কেদারনাথ দত্ত। দীর্ঘায়ু পত্রিকা।' এছাড়া Calcutta Review (1863), Reinhold Rost (1880), Amrita Bazar (1894), Asiatic Society (London, 1897) ও R. W. Frazer এর A Literary History of India তে বিভিন্ন উচ্চপ্রশংসিত মন্তব্যের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সজ্জনতোষণী সম্বন্ধে কেদারনাথ নিজেই লিখেছেন—"আদৌ বৈষ্ণব সমাজের কোন পত্রিকা ছিল না। এখন দেখিতেছি, সজ্জনতোষণীর উৎসাহে ঢাকার 'রত্নাকর' বালেশ্বরের 'শ্রীহরিভক্তি প্রদায়িণী'…এবং কলিকাতার 'বৈষ্ণব' নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে" (স, তো, ১৮৮৫,

কেদারনাথ আবিষ্কৃত মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মভিটায়
অভ্রভেদী যোগপীঠ শ্রীমন্দির
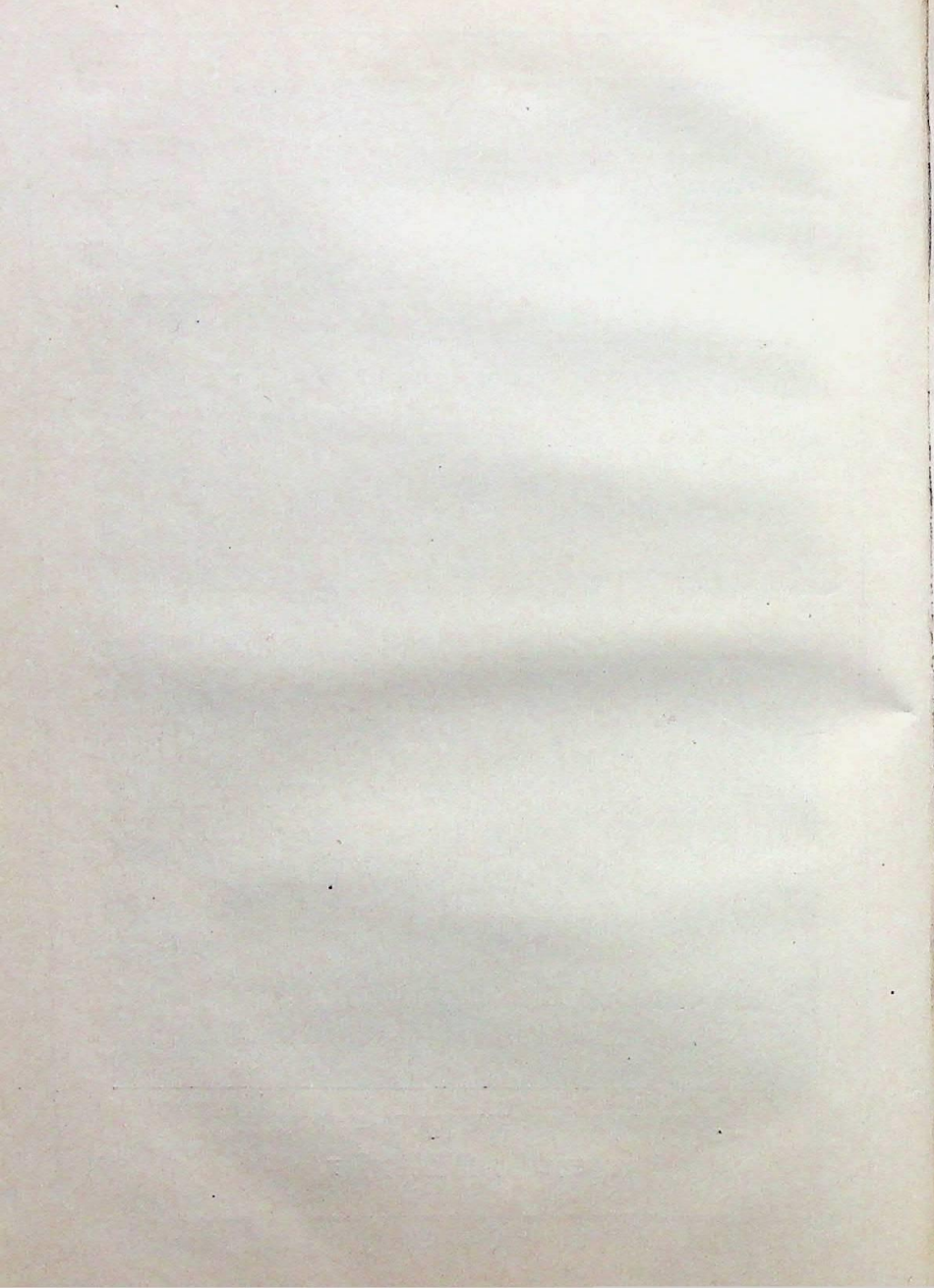
২।১২) "একসময়ে এই 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ব্যতীত আর কোনও পারমার্থিক পত্রিকা ছিল না। সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে সজ্জনতোষণী এরূপ পারমার্থিক উত্তেজনা (আনয়ন) করিয়াছেন যে, (তৎফলে) আজ কাল এতগুলি পত্রিকা উদয় হইল,—এইটি বড় সুলক্ষণ" (স, তো, ১৯০০, ১২।১।১)।

—চার—

রচনাসম্ভার

কেদারনাথের সমগ্র রচনার কোন নির্ভরযোগ্য তালিকা পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে অল্পসল্প ত্রুটীপূর্ণ হলেও প্রশংসনীয় প্রাথমিক কাজ করে গেছেন শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (গৌড়ীয় ১৯২৭, ৬।৬।৬) ও সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় (Thakur Bhakti-Vinode, 1916)। বর্তমান লেখক বহু পত্রপত্রিকা ও মূল গ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে এখানে দেওয়া তালিকাটিকে যথাসাধ্য বিস্তারিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রে কেদারনাথের প্রকটকালে প্রকাশিত প্রথম এবং অন্য সংস্করণের ইংরাজি সাল দেওয়া হয়েছে। অপ্রকাশিত রচনার কাল বন্ধনীর মধ্যে আছে এবং সম্পাদনা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকার ক্ষেত্রে মূল রচয়িতার নাম পাওয়া গেলে গ্রন্থের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

ক। মৌলিক রচনা ঃ

১। হরিকথা (পদ্যে) ১৮৫০

২। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ (কাব্য) ১৮৫১

৩। সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ রচনা শুরু ১৮৫৫

৪। Poriade-I & II (কাব্য) ১৮৫৭-৫৮

৫। Maths of Orissa (প্রবন্ধ) ১৮৬০

৬। বিজনগ্রাম (লেখা ১৮৫৭) (কাব্য) ১৮৬২

৭। সন্ন্যাসী " ১৮৬৩

(৬ ও ৭ যুগ্ম ২য় সং ১৯০২)

৮। Our wants (গদ্যে) "

৯। বালিদে রেজিষ্ট্রী বা Manuals of Registration (উর্দু) ১৮৬৬

১০। Speech on Gautam (গদ্যে) "

১১। " " Bhagabat " ১৮৬৯

১২। Reflections (পদ্যে) ১৮৭১

১৩। Couplets on Haridasa's burial "

১৪। " " Puri Temple "

১৫। " " " Monastery "

১৬। বেদান্তাধিকরণমালা (পদ্যে) ১৮৭২

১৭। দত্তকৌস্তুভম্ (সংস্কৃত) " ১৮৭৪

১৮। দত্তবংশমালা " " ১৮৭৬

(২য় সং ১৯০০)

১৯। বৌদ্ধবিজয় (অসম্পূর্ণ সংস্কৃত কাব্য) (১৮৭৮)

২০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত শ্লোক ও টীকা) ১৮৮০
(২য় সং ১৯০৩)

২১। কল্যাণকল্পতরু (গীতাবলী) (২য় সং ১৮৯৭) ১৮৮১

২২। দশোপনিষদ চূর্ণিকা (পদ্যে) ১৮৮৬

২৩। প্রেম প্রদীপ (গদ্যে) „

২৪। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা (তত্ত্ব) „ ১৮৮৮

২৫। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ডঃ), বিভিন্ন শ্লোক উল্লেখে
মায়াপুর-অন্তর্দ্বীপ প্রমাণ ১৮৯০
ও নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (পরিক্রমাখণ্ড) (পদ্যে) „

২৬। বিশ্ববৈষ্ণব কল্প টবী (হরিনাম, নাম, নাম-তত্ত্ব···কীর্তনসহ
'নামহট্ট' ও 'ভক্তিআসন'-এর কার্য) ১৮৮৪-৯২

২৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (পদ্যে) ১৮৯২

২৮। শরণাগতি (গীতাবলী) ১৮৯৩

২৯। শোকশাতন „ „

৩০। জৈবধর্ম (গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত/গদ্যে)
(সজ্জনতোষণীর সঙ্গিনী হিসাবে প্রথম
ধারাবাহিক প্রকাশ/১৮৯২-৯৮) (গদ্যে) ১৯০১

৩১। আত্মজীবনচরিত „ ১৮৯৬ ?

৩২। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্ (সংস্কৃত) ১৮৯৬

৩৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu
His Life and precepts „ „

৩৪। নবদ্বীপভাবতরঙ্গিণী (পদ্যে) ১৮৯৯
৩৫। হরিনামচিন্তামণি " ১৯০০
৩৬। স্বনিয়ম দ্বাদশকম্ (অসম্পূর্ণ) (১৯০৭)

খ। সম্পাদনা ঃ

৩৭। সজ্জনতোষণী (মাসিক পত্রিকা) ১৮৮১-১৯১৪
৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মধ্বভাষ্য) ১৮৯৮
৩৯। পদ্মপুরাণ (বেদব্যাস) ১৯০১
৪০। সৎক্রিয়াসার দীপিকা (গোপাল ভট্ট) ১৯০৪
৪১। শ্রীপ্রেমবিবর্ত (জগদানন্দ পণ্ডিত) ১৯০৬

গ। অনুবাদ ঃ (সটীক)

৪২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থবর্ষিণী টীকা) ও রসিকরঞ্জন টীকা ১৮৮৬
৪৩। মনঃশিক্ষা (রঘুনাথ দাস গোস্বামী) (পদ্যানুবাদ) "
৪৪। সিদ্ধান্ত দর্পণ (বলদেব বিদ্যাভূষণ) ১৮৯০
৪৫। ব্রহ্মসংহিতা (প্রকাশিনী বৃত্তি) ১৮৯৭
৪৬। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (জীব গোস্বামী) ১৯০১
৪৭। ভজন রহস্য (সঙ্কলিত সংস্কৃত শ্লোক) (পদ্যানুবাদ) ১৯০২

ঘ। ভাষ্য, ব্যাখ্যা, টীকা, সমালোচনা ঃ

৪৮। গর্ভস্তোত্র (সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা/বেদব্যাস) ১৮৭০
৪৯। নিত্যরূপ সংস্থাপন (English Review in Sajjan Toshani) ১৮৮৩
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (২য় সং ১৯০৫) ১৮৮৬

৫১।	শিক্ষাষ্টক (সম্মোহন ভাষ্যসহ/সংস্কৃত)	১৮৮৬
৫২।	ভাবাবলী (সংস্কৃত শ্লোক সংকলন)	,,
৫৩।	শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম (বেদব্যাস) (বলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যসহ)	,,
৫৪।	শ্রীকৃষ্ণবিজয় (গুণরাজ খান)	১৮৮৭
৫৫।	শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ (চৈতন্যচরণামৃত সংস্কৃত ভাষ্যসহ)	,,
৫৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য) 'বিদ্বদ্‌রঞ্জন' ভাষ্যসহ	১৮৯১
৫৭।	শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্ (বেদার্থ নির্ণয়/১৮৯২)	১৮৯৫
৫৮।	তত্ত্ববিবেক (সংকলন)	১৮৯৩
৫৯।	তত্ত্বসূত্র ,,	১৮৯৪
৬০।	ঈশোপনিষদের বেদার্কদীধিতি ব্যাখ্যা	,,
৬১।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ শতদূষণী (মধ্বাচার্য)	,,
৬২।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য (১৮৮০-৮২ ও ১৮৯০-৯২)	১৮৯৫
৬৩।	শ্রীরামানুজ উপদেশ	১৮৯৬
৬৪।	অর্থ-পঞ্চক (সংকলন)	,,
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ (বিল্বমঙ্গল)	১৮৯৮
৬৬।	উপদেশামৃতম্ (রূপগোস্বামী) (পীযূষবর্ষিণী বৃত্তিসহ)	,,
৬৭।	শ্রীভগবদ্ধামামৃতম্ (সনাতন গোস্বামী)	,,

৬৮। ভক্তিসিদ্ধান্তামৃতম্ (সনাতন গোস্বামী) ১৮৯৮

৬৯। ভজনামৃতম্ (নরহরি ঠাকুর) ১৮৯৯

৭০। শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা (সংকলন) ১৯০১

কেদারনাথের অপ্রকটের পর পরবর্তী গোস্বামীগণের সম্পাদনায় তাঁর নামে যে সমস্ত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল (যেমন—দশমূল শিক্ষা, গীতাবলী, গীতমালা ইত্যাদি) সেগুলো এখানে ভুক্ত করা হ'ল না।

—পাঁচ—

সাহিত্য প্রতিভা

কেদারনাথ দত্তের দেড়শততম জন্মবর্ষে বাঙালীর মানস পটভূমিকায় তাঁর বহুমুখী অবদানের সবচেয়ে অনাবিষ্কৃত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি এখন এখানে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। এই ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে। আবাল্য ধর্মিক্ষু মননের জন্য ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেদারনাথ সচেষ্টভাবে সাধারণের বিনোদন বা লোকরঞ্জন সাহিত্য রচনা করেননি। তাঁর রচনাবলীকে প্রকৃতপক্ষে ভক্তি-বিনোদন-সাহিত্য বলা যেতে পারে। তার ফলে সাধারণ বিনোদন -সাহিত্য পিপাসুদের কাছে তাঁর অনবদ্য সাহিত্য অবদান অজানিত রয়ে গেছে। মূলতঃ ধর্মভিত্তিক রচয়িতা হলেও বহুক্ষেত্রে তাঁর রচনার রস

বিনা আয়াসেই ধর্মনিরপেক্ষ পাঠককেও শাশ্বত আনন্দ দানে সমর্থ। ছন্দসৃষ্টি, শব্দচয়ন ও ভাষাবিন্যাসেও সে যুগের সমসাময়িক রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী আসন পাওয়ার কথা।

কেদারনাথের রচনার বৃহত্তর অংশ রয়েছে বাংলা কাব্যাকারে। তার মধ্যে আবার গীত রচনাই প্রধান। বাংলা গদ্যরচনাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কয়েকটি একেবারে যুগান্তকারী ও তুলনাহীন (যথা—'জৈবধর্ম' ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য)। তিনি নিজে সুগায়ক ও সুখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। কর্মজীবনে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহেবী 'ধড়াচূড়া' ছেড়ে বস্ত্র উত্তরীয় পরিধানে বিশিষ্ট/নির্বিশেষ জনসমাবেশে ('ভক্তি-আসনে' বা 'নামহট্টে') আত্মরচিত কীর্তন গানে, মহাজন পদাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যায় শুদ্ধ-ভক্তি ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর ভক্তি শ্রোতার মনে বিনোদনের বা পরমানন্দের সৃষ্টি করত বলে তিনি কর্মজীবনেই 'ভক্তিবিনোদ' নামে আখ্যাত হলেন। তাঁর মৌলিক ও ব্যাখ্যাসূত্রে সংস্কৃত, এবং মৌলিক ইংরাজী রচনাও উল্লেখ করার মত যথেষ্ট (রচনাসম্ভার দ্রষ্টব্য)।

মুখ্যতঃ ধর্মভিত্তিক হওয়ায় কেদারনাথের রচনাকে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি মনীষিগণের রচনার সমপর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাসবেত্তারা এঁদের সকলের কথা উল্লেখ করলেও তাঁদের ইতিহাসগ্রন্থে কেদারনাথের উল্লেখমাত্র করতেও ভুলে গেছেন। কেদারনাথের সাহিত্য আলোচনাকালে সমকালীন অন্য রচয়িতা-দের রচনাকে এই অধ্যায়গুলিতে তুলনামূলকভাবে আনা হয়েছে। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে এই আলোচনায় আনা হ'লনা কারণ তাঁরা কেদারনাথের সমকালীন নন, বেশ কিছুটা পরবর্তী কালের। তাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তুলনাহীন। অন্য রচয়িতাদের তুলনায় কেদারনাথের শ্রেষ্ঠত্ব বা অপকর্ষতা নির্ণয় এ আলোচনার মুখ্যবস্তু নয়। তাঁর রচনা নিজগুণে রসোত্তীর্ণ ও শাশ্বত মূল্যে মূল্যবান হয়ে থাকলে তা বিদগ্ধজনের দৃষ্টিগোচর করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সমকালীন স্বীকৃত সাহিত্যিকদের রচনা সমালোচকদের মূল্যায়নের মান হিসাবেই উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কেদারনাথের সুবৃহৎ সাহিত্যকীর্তির আলোচনা আপাততঃ এখানে কাব্যসাহিত্যের আলোচনা মাধ্যমেই সূত্রপাত করা হ'ল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত রচনাসম্ভারের ২৩, ২৪, ২৬, ৩৪ ও ৩৫ সংখ্যক রচনায় এবং পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বেশ কিছু কবিতা (গান) পরবর্তীকালের কয়েকটী সংকলনে স্থান পেয়েছে। এর কিছু কিছু বর্তমান লেখককে উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছে।

কাব্যসাহিত্য ঃ প্রবহমান-ছন্দ প্রবর্তক

কেদারনাথের বাল্যকাল কেটেছিল নদীয়া জেলার উলা গ্রামে (বীরনগর) মাতামহের গৃহে। এই গ্রামটির সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ মমতাময় সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী কালে শিক্ষার প্রয়োজনে এই গ্রাম ত্যাগ করলেও এখানকার অনেক পল্লীচিত্র তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। ১৮৫৬ তে ভয়ঙ্কর মহামারীর ভয়ে যখন গ্রামটি একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়, তার পরেই আঠার বছর বয়স্ক তরুণ কেদারনাথ এখানে এসে বিজন জনপদ দেখে মনে প্রচণ্ড আঘাত পান। মনের পটে বাল্যস্মৃতি থেকে নানা রঙের ছবি ফুটে উঠতে থাকে।

সেই ছবিগুলি তিনি একটি নতুন ছন্দের মালায় গেঁথে তোলেন ১৮৫৭ সালে। কিন্তু এই অপরিচিত তরুণ কবির তখনো বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিত একটি নতুন ছন্দের কাব্য মালিকা মুদ্রণের জন্য কোন সাহসী প্রকাশক সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না। অবশেষে যখন ১৮৬২ তে প্রবহমান ছন্দে এই ক্ষুদ্র কাব্য 'বিজনগ্রাম' মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল, তখন তার ভূমিকায় ইংরাজী ভাষা-সাহিত্যে পটু তরুণ কবি লিখলেন,— "এক নূতন প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই সহসা আশ্চর্য্য হইতে পারেন ও কেহ কেহ কুৎসিৎ পদ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তজ্জন্য এই প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইল। বঙ্গ ভাষায়······পয়ারে দ্বিতীয় চরণে কবিতার ভাব শেষ হয়। ······পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয়। দুই চরণের মধ্যে কবিতার ভাব প্রকাশ করিবার প্রথা অসম্পূর্ণ বোধ হওয়ায় ইংলণ্ড দেশে বাইরণ নামক মহাকবি উক্ত প্রণালী একেবারে ভঙ্গ করেন। ঐ দেশস্থ সমস্ত লোকেই তখন পূর্বপ্রথা অনুপযুক্ত বিশ্বাস করিলেন। বঙ্গ ভাষায় ঐ প্রথাটিকে এই পুস্তকে ভঙ্গ করা গিয়াছে। প্রথমে এই নূতন প্রণালীটি সকলের ভাল লাগিবে না, কিন্তু যখন প্রচলিত সংস্কার হইতে পাঠকগণের কর্ণ বিমুক্ত হইবে তখন ইহার লালিত্য একেবারে বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। ··এই নূতন ছন্দে যদি কবিগণ বঙ্গভাষায় উত্তম উত্তম পদ্য লিখিতে চেষ্টা করেন তবে আমাদিগের মাতৃভাষার এক নূতম কবিতার সৃষ্টি হইবে। ······এই গ্রন্থ পাঠকালীন অষ্টম অক্ষরে ও চরণে শেষ বিশ্রাম না করিয়া পাঠক মহাশয়েরা স্থানে স্থানে ছেদ সকল বিবেচনা করিলেই কবিতার ভাব ও পদ্যের রস

বোধ করিতে পারিবেন।" কেদারনাথের আগেই যদি এই ছন্দের চল বাংলা সাহিত্যে হয়ে থাকত, তাহলে এই ভূমিকার প্রয়োজন হ'ত না। অবশ্য ১৮৬০-এ সে যুগের সাহিত্যসূর্য মাইকেল মধুসূদন 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে নিজে অমিল প্রবহমান ছন্দের প্রথম পরীক্ষা করেন ('পদ্মা-বতী'তে আংশিক/১৮৬০) ও ঐ ছন্দে তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেঘনাদ-বধ' পৃথক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ তে। একথা এখানে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই দুই ইংরাজিনবিস কবি, বায়রণের blank verse-এর অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণ পৃথক ও মৌলিকভাবে প্রবহ-মান ছন্দে কাব্যরচনা করেছিলেন। কবি হেমচন্দ্রের সম্পাদনায় পূর্ণাঙ্গ 'মেঘনাদ-বধ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ তে (মধুসূদনের বয়স তখন ৩৯ বছর)। সমকালে কেদারনাথ ভিন্ন অন্য কোন কবি এই ছন্দে কাব্য রচনা করেন নি। এ ছন্দ পাঠেই বেশ কিছুকাল সকলকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল এবং রপ্ত করতে আরও কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল। সুতরাং কবি মধুসূদনের কৃতিত্ব কিছুমাত্র লাঘব না করেও নির্দ্বিধায় কবি **কেদারনাথকে বাংলা সাহিত্যে এই ছন্দের প্রথম প্রবর্তক বলা যেতে পারে।** কাব্যগুণেও 'বিজনগ্রাম' কোন অংশে অপাংক্তেয় নয়।

মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', ১৩৫২, পৃঃ ১০৬-৭)—'মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রবহমানতা ; অমিত্রাক্ষরতা বা মিলের অভাবটাই ওই ছন্দের অচ্ছেদ্য বা অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয়। সুতরাং মেঘনাদবধ-এর ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ নামে অভিহিত করলে সব কথা, এমন-কি আসল কথাটাই বলা হয় না। কারণ ও-নামটি একটিমাত্র গুণের

অভাব-সূচনাই করে ও ছন্দের আসল স্বরূপটিই জ্ঞাপিত হয় না। Blank Verse এর বাংলা নাম 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' হতে পারে ; কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা Blank Verse-এরও মূল কথা নয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দের যদি কোনো যথার্থ নাম দিতে হয়, তবে তাকে বলা উচিত 'প্রবহমান পয়ার' ছন্দ। ···এই প্রবহমান পয়ার ছন্দ অ-মিলও হতে পারে, স-মিলও হতে পারে, মিলের অভাব বা সদ্ভাবে এর আসল প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য ঘটে না।'

যদিও মধুসূদন স্বয়ং 'অমিত্রাক্ষর-ছন্দ' কথাটি মেঘনাদবধ কাব্যের মঙ্গলাচরণেই প্রথম ব্যবহার করেছেন (২২ শে পৌষ ১২৬৭), এ ছন্দে -লেখা তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখলেন (মধুসূদন রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ / সম্পাঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ আটাশ-উনত্রিশ)—'Good Blank verse should be sonorous and the best writer of blank verse in English is the toughest of poet—mean old John Milton !....You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends ···Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.'

দেখা যাচ্ছে তিনিও এখানে যতি অনুযায়ী পাঠককে পড়ার সময় থামা দিতে বলেছেন, আর এই নতুন সুরের জন্য বার বার পড়ে কান তৈরী করতে বলেছেন। কিন্তু কোথাও অন্ত্যানুপ্রাসের অভাবের ওপর গুরুত্ব দেননি। মহাকবি ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথও একে 'পংক্তিলঙ্ঘক' বা 'লাইনডিঙানো' ছন্দ বলেছেন, যা প্রবহমানতাই নির্দেশ করে, অর্থাৎ যার ভাব পয়ারের দুই পংক্তির মধ্যেই সকল সময় সীমিত থাকে না, পরবর্তী পংক্তিতে প্রবাহিত হয়।

প্রবহমান ছন্দ সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, এখানে যেন খেয়াল গানের নানা মাপের তান কর্তব চলেছে, হচ্ছে স্বল্পক্ষেপণ বা দূরক্ষেপণ। কিন্তু নেপথ্যে নিরন্তর ছন্দ-সমতা বজায় রেখে চলেছে তানপুরার তান। মধুসূদনের পয়ারে চেষ্টাকৃত অন্ত-মিল পরিহার মেঘনাদ-বধ কাব্যে একটা কাব্যবিরোধী-পরুষভাব এনে দিয়েছে—যেটা নাটকের পক্ষেই উপযুক্ত। এখানে যেন ওই খেয়াল-গানের অসম-প্রবহমানতার মধ্যে তানপুরার তানেরই অভাব। যেখানে স্বাভাবিকভাবেই কাব্যগত ছন্দনিক্কন আসছে, সেখানেও জেদ করে অমিল আনতে গিয়ে কাব্য যেন হোচট্ খেয়েছে। সার্বিক নাটকীয়তা (ক্ষেত্রে অতিনাটকীয়তা) কাব্যধর্মী রচনায় একটা কৃত্রিমতা এনে দিয়েছে।

মধুসূদনের আগে কেদারনাথের সমিল-প্রবহমান ছন্দে রচনায় ('বিজনগ্রাম') এই কৃত্রিমতা নেই। প্রবহমানতায় কেদারনাথ বাংলা পয়ারের প্রথম বন্ধনমুক্তি ঘটালেন বটে, কিন্তু সমিল হওয়া সত্ত্বেও অন্ত্যানুপ্রাস এখানে প্রাধান্য পায়নি, তবে তা একটা নেপথ্য তান-পুরণের আবেশ ধরে রেখেছে। তার ফলে রচনায় আগাগোড়া কাব্যধর্মীতা

বজায় থেকেছে। পরবর্তীকালে এই ধারাই রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছে ('মালিনী'র ছন্দ)। সুতরাং কেদারনাথকেই নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যে প্রবহমানতার প্রবর্তক বলা যেতে পারে ; যদিও মধুসূদন স্বল্প পরেই (স্বাধীনভাবে) অমিল-প্রবহমান বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে চম্‌কে দিলেন।

এবার এখানে কেদারনাথের বিজনগ্রাম থেকে কিছু কাব্যরসঘন উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। মড়কে উৎসন্ন বিজন জন্মস্থানে পৌঁছে তরুণ কবি পরের পর স্মৃতিচারণ করে চলেছেন ঃ—

বিজনগ্রাম—১৮৫৭/কেদারনাথ দত্ত

বটগাছতলায় গ্রামের সিঁদুর মাখানো সিদ্ধিদাতৃ দেবী উলাচণ্ডীকে সাক্ষ্য রেখে কবি বলছেন—

'তুমি বিনা কেবা পারে করিতে স্মরণ
অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব,-পূর্ব্ব বিবরণ
ভ্রমে যাহা স্মৃতিরূপা ; যেন অনাথিনী
ভ্রমিতেছে দেশ ছাড়ি, সদা বিদেশিনী
হারাইয়া নিজ নিজ বাস। এই ত্রিভুবনে
তুমি বিনা জানে কেবা পূর্ব্বে কি কারণে
মনোহর নদীকূলে রাখে সদাগর
পরিমাণ শিলাখণ্ড—সুন্দর প্রস্তর।
শোভিতে বট-বিটপী ? সিন্দুরে মণ্ডিয়া
আহা ! কি সুন্দর শোভা ! রাখিলা লইয়া

তাহা বেদির উপরে জনপদবাসী
গণ, পূজিতে দেবীরে, বর অভিলাষী।'

(বিজনগ্রাম, পৃঃ ২)

অপরাহ্নে গ্রামের চতুষ্পাঠীর ছুটিতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ঘরে ফিরছেন। পণ্ডিতদের হাতে নস্যের টিপ, কণ্ঠে পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার, পথেও কূটতর্কের বিরাম নেই। পিছনে দেশী-বিদেশী তরুণ ছাত্ররাও পুষ্ট শিখা নেড়ে নিজেদের মধ্যে তর্কমুখর ; শুধু ভয় নৈয়ায়িক অধ্যাপকরা কেউ নিজেদের মধ্যে তর্কে হারলে ছাত্রদের ওপর এসে চড়াও না হন। সব মিলিয়ে একটি সজীব রসাল চিত্র। যেমন—

"কোথাও ব্রাহ্মণগণ বেলা অবসান
দেখি' চতুষ্পাঠী ছাড়ি' করিত প্রস্থান ;
... ...করিয়া ধারণ
নস্যের শামুখ করে চলিতেন সবে
পথমধ্যে কতশত তর্ক-কলরবে,—
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত লইয়া
ঘোরতর দ্বন্দানল উঠিত জ্বলিয়া ;
যাহার কণ্ঠের স্বর অতি বলবান
বাক্যরণে জয়ী সেই, কে তার সমান ?

... ...

কেহবা স্থাপিত তবে পরমাণুবাদ
বৈশেষিক সূত্রমতে, 'কণাদ' 'কণাদ'

উচ্চরব উঠি' তবে আক্রমিত কর্ণ
সবাকার, সাংখ্য-শিষ্যে করিয়া বিবর্ণ ;

... ...

মধ্যস্থ অভাবে ব্যঘ্রকণ্ঠ-মহাশয়
সারমেয়-কণ্ঠ-ছাত্রে করি' পরাজয়,
ধরিতেন শিখা তার ; সগর্ব-বচনে
বাক্যহীন করিতেন তারে পাস্থ-রণে ;
সিংহকণ্ঠ অন্য ছাত্র ঘট-পট করি'
পরাজিত তাহে পুনঃ তার শিখা ধরি ;
স্মার্ত-ছাত্র মধ্যে 'মলমাস'-তর্ক লয়ে
হইত বিষম রণ ! নৈয়ায়িক-ভয়ে
নিস্তব্ধ হইত তারা ! নৈয়ায়িক শূর
বলিতেন, রঘুনন্দনের গাধা দূর দূর !

... ...

এইরূপে ছাত্রবৃন্দ কত কথা বলি'
যাইতেন অপরাহ্নে রাজপথে চলি ।"

(বিজনগ্রাম, পৃঃ ৮-১০)

আধুনিক কবিগণ অপরাহ্নে গ্রামের পুকুর ঘাটে ললনাদের জমায়েত নেপথ্য হতে দেখলে শুধু স্নানরতাদের দেহবর্ণনাই করেন ; কিন্তু তরুণ কবি কেদারনাথ অন্য ধাতুর মানুষ ছিলেন। তিনি এই ললনাকুলের মনোজগতের চিত্র কি রসঘন ও বাস্তব ভাবেই না পরিবেশন করলেন !—

'অদূরে হইত দৃশ্য পল্লীর কামিনী
গণ, সরোবর তটে, লইবারে বারি
আসিত সকলি মিলি হয়ে সারি সারি।
দুঃখে সুখে যেই রূপ যায় দিনকর,
সংসারের কথা সব কহি পরস্পর
চলিত সভয়ে সদা ; দেখিত যখন,
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
হয়ে লুকাইত তবে, তরুগণ পাশে ;
মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে।
কেহবা বলিত,—দিদি ! শোভাঞ্জন শাক
স্বল্প-তৈলে আজি আমি করিছিনু পাক,
কি সুন্দর ! খেয়ে তাহা দেবর আমার
কত যে সুখ্যাতি মোর কৈল বার বার !
কেহ বলিতেন,—আজি নৈবেদ্য মটরে
হইল অপূর্ব্ব ডাল্‌না, কি বলিব তোরে !
আমি ত মোচার ঘণ্ট মসলা না দিয়া
করিছিনু আজি পাক, মুখেতে খাইয়া
প্রশংসিল কর্ত্তা মম !—কহে অন্যজন
সুখে ঘুরাইয়া দুই খঞ্জন-নয়ন।
কেহ বলে,—দিদি আমি বড়ই দুঃখিনী,
কথায় জ্বালায় মোরে দুই ননদিনী
হিংসা করি' ! রাত্রিদিন খাটি গৃহকর্ম্মে,

তবু মোর কথা কয়, লাগে বড় মর্ম্মে !
কেহ বলে,—বিধি মোর নিরন্তর বাম,
পতি মম কাশীবাসী, নাহি করে নাম
মম, হায় ! শুনিয়াছি ল'য়ে অন্যজনে
আছেন মজিয়া তথা আপনার মনে।
অপর ললনা এক সজল-নয়নে
বলিলেন মৃদুস্বরে,—কাজ কিবা ধনে ?
নবীন-যৌবনে পতি সন্ন্যাস করিলা
গৃহে রখি সুকুমারে ; বাছা জিজ্ঞাসিল,—
কোথা মাগো ! মোর পিতা ? কি বলিব আর ?
অতি শিশু—নাহি বুঝে বচন আমার !

... ...

আর কি দেখিব সেই পতিব্রতাগণে,
আর কি শুনিব সেই কথা সঙ্গোপনে ?'

(বি, গ্রা, পৃঃ ১১-১২)

কেদারনাথের পরিবেশিত গ্রামের ভোজের বর্ণনা আজও পাঠকের রসনা সিক্ত করবে,—

"দেখিয়াছি গ্রাম্যভোজ ! নিমিত্ত ঘটনে
পংক্তি পংক্তি বসিতেন গ্রামবাসীগণে
কলাপাতা বিছারিয়া, বামে ধরি' জল
হৃষ্টমনে ! অন্ন-শাক-ব্যঞ্জন সকল,
ডাল, ডাল্না, চচ্চড়ী, মোচাঘণ্ট, ভাজা,

শাক, অম্ল, দধি, ক্ষীর, গোল্লা, গজা, খাজা
খাইতেন বহুতর। চৌদিকে সর্ব্বথা
'আন', 'দেও', 'আর চাই ?' এইমাত্র কথা।
সে-সময়ে সকলেই সমর্থ ভোজনে,
খাইতেন যত,—কবি অশক্ত বর্ণনে।
বড় বড় দধিভাণ্ড কত যে আসিত
ভোজে! পরমান্ন পরিমাণ কে করিত?
কোথা সেই বৃদ্ধ যিনি শতাধিক বর্ষে
ভুঞ্জিতেন একাধিক ভাণ্ড অতি হর্ষে?
বালক-বালিকাগণ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া
মিষ্টখাদ্য ল'য়ে যেতো ভোজন করিয়া,
ভোজনান্তে উঠিতেন একত্রে সকলে;
আসিত তখন মুচী-হাড়ী দলে দলে,
লইত উচ্ছিষ্ট-পত্র; কুক্কুর-নিবহ
পরস্পরে ঈর্ষা করি' করিত কলহ,
হইত তুমুল রব,—যুদ্ধক্ষেত্রে যথা
যুদ্ধশেষে লুটপাট! অপূর্ব্ব সে কথা!"

(বি, গ্রা, পৃঃ ১৫-১৬)

অপরদিকে রম্য স্মৃতিচিত্রে ভরা জন্মভূমি বীরনগর (উলাগ্রাম) যখন মড়কের কবলে 'বিজনগ্রাম'-এ পরিণত, তখন সেই তিক্ত-করুণ দৃশ্যে কবি মর্মাহত। তরুণ কবির বেদনাপ্লুত মন কি হৃদয়বিদারক বাস্তব চিত্রই না ফুটিয়ে তুলল,—

… … আলোক-প্রবেশে
জনপদে বাহিরিয়া, দেখি অবশেষে
যমপুরী যেন গ্রাম ! হাহাকার-স্বর
শুনিয়া সকল দিকে, কাঁপিলা অন্তর !
দেখিলাম গৃহে গৃহে কুকুরের গণ—
ভীষণ আকৃতি সব, আরক্ত নয়ন
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়-অন্তরে,
নরমাংস খেয়ে খেয়ে নাহি ডরে নরে ;
… … …

দেখ যত গুলিখোর, গাঁজাখোর আর
গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া, পর-উপকার-
ছলে সালঙ্কার শব করিছে বাহির,
নিজ লাভ আশামাত্র চিত্তে করি স্থির !
নর হ'য়ে শকুনী-গৃধিনী-মাঝে সবে
ভ্রমিতেছে ঘরে ঘরে ধূম্রের উৎসবে !
… … …

দেখিলাম,—কোন গৃহে মৃতশিশুকোলে
শুইয়া রয়েছে মাতা মহাজ্বর-ভোলে
অচেতন ; নাহি জানে কখন ঘটিল
ঘোরতর সে আপদ,—বালক মরিল
করিতে করিতে স্তনপান ! জনশূন্য কত
পড়ি' আছে অট্টালিকা দেখি শত শত,

নাহি আছে, রুদ্ধদ্বার ; পথের ভিতরে
পড়ি' আছে মৃতকায়া, লোকাভাব তরে
না হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয় !!'

(বি, গ্রা, পৃঃ ২৯-৩০)

'বিজনগ্রাম'-এর অব্যবহিত পরে কেদারনাথ প্রবহমান ছন্দেই 'সন্ন্যাসী' ক্ষুদ্রকাব্যটি রচনা করেন (পরিশিষ্টে Calcutta Review পত্রিকায় সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। সন্ন্যাসী কাব্যে প্রবহমান ছন্দে কেদারনাথ 'বিংশতি বর্ষ, শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে ছিলেন দীক্ষিত'—এমন এক পরিব্রাজকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে' 'এক সুচারু নগরে' পৌঁছে 'যতিবর' একটি জনহীন উন্মুক্ত গৃহে রাত্রে আশ্রয় নিয়ে নিদ্রা গেল। কিন্তু সে 'নিশা, না হইতে ভোর চমকি উঠিলা' ; দেখল নগর রক্ষীরা চোর বলে 'বান্ধিতেছে হস্ত তার', আরও দুজন চোর 'পার্শ্বদেশে বাঁধা হয়ে করিছে রোদন'। তার কোন প্রতিবাদে কান না দিয়ে রক্ষীরা তাকে অন্য চোরদের সঙ্গে বিচার-ভবনে নিয়ে এল। সেখানে ধর্মরাজ—

'সন্ন্যাসীরে ডাকি বলে,—বলহ নিশ্চয়,
চুরি করিয়াছ কিনা ? না করিহ ভয়
কিছু মনে। যাহা ইচ্ছা তাহা বল এবে,
বিচার-আলয়ে সত্য প্রকাশ হইবে।
কিছুই না জানি আমি, কেন যে আমারে
আনিল এখানে সবে, কিসের বিচারে ?

—কহিল সন্ন্যাসীবর। ধর্ম্ম অবতার
শীঘ্র লিখিলেন নিজে কথাটী তাহার।
পুনঃ প্রশ্ন হৈল তবে,—সাক্ষী কোন জন?
'হরি মোর সাক্ষী'—ন্যাসী করে নিবেদন।
কোথা সে হরির বাস,—পেস্কার জিজ্ঞাসে;
'বৈকুণ্ঠ নগর' বলি' ন্যাসী মৃদু হাসে।
বিচারের দিন পরিবর্ত্তন হইল,
হরিকে আসিতে আজ্ঞা-পত্রিকা চলিল॥'

(সন্ন্যাসী, পৃঃ ৮-১১)

কিন্তু দিনের পর দিন সাক্ষী 'হরি' না আসায় সন্ন্যাসীকে ধর্মরাজ 'প্রাচীন তস্কর' সিদ্ধান্তে দীপান্তরের সাজা দিলেন। যে জাহাজে সন্ন্যাসীকে দ্বীপান্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে জাহাজ পথে ঝড়ে পার্বত্য দ্বীপে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হ'ল, কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় সন্ন্যাসী ঐ দ্বীপে গিয়ে পড়ল। কয়েকদিন পরে আর একটি চল্‌তি জাহাজ সেই পার্বত্য দ্বীপে দূর থেকে সন্ন্যাসীকে দেখে উদ্ধার করে দেশের জন্য এক উপকূলে নামিয়ে দিয়ে গেল। আবার হ'ল চলার শুরু, আর হ'তে থাকল বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। সন্ন্যাসীর ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল।

তবে একথা এখানে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা কাব্যে প্রবহমান ছন্দের সেই উষা-লগ্নে 'সন্ন্যাসী' খুব সফল উদাহরণ নয়, অনেকাংশেই প্রচলিত বন্ধপয়ারের রূপটিই বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন ছন্দে বরং 'বিজনগ্রাম' অনেক বেশী সাফল্যের নিদর্শন।

এরপর মধুসূদন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী কবিদের কিছু প্রবহমান ছন্দে রচনার নমুনা তুলনামূলক ভাবে নেওয়া যাক।

তিলোত্তমাসম্ভব—১৮৬০/মধুসূদন

বীণাপানি বন্দনা—

'এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপানি? কবি, দেবী, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি
তব কৃপা মন্দার দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি মা কবিতামৃত—নিরুপমা সুধা।'

দ্রষ্টব্য: কেদারনাথের গ্রাম বাংলার প্রাণের ভাষা; আর এটি সংস্কৃত মন্থন করা কৃত্রিম নাটকীয় ভাষা, যেখানে পদে পদে অভিধানের প্রয়োজন।

মেঘনাদ-বধ—১৮৬১-৬২/ মধুসূদন

৫ম সর্গ—

'উর্ব্বশী, মেনকা রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারিদিকে। সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদ্রিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে

চির বাঞ্ছা ! মৌনভাবে বরিলা দম্পতি,
হেনকালে মায়াদেবী উত্তরিল তথা ।'

অবকাশরঞ্জনী—১৮৭১/নবীন সেন

পিতৃহীন যুবক—

'আহা ! কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী !
নীরব প্রকৃতিদেবী ; অবিচল প্রায়
জীবন প্রবাহ এবে, নির্জীব ধরণী ;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায় ।
না পায় শুনিতে কর্ণ ; না দেখে নয়ন ;
ঘোর নিদ্রা অভিভূত বসুধা এখন । ১ ।'

বৃত্রসংহার—১৮৭৭/হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২য়খণ্ড, ২১শ সর্গ—

'কোথাও আবার কোন (ও) বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে ! কত জনপদ
উন্নতি সোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে !'

মন্তব্য ঃ মাইকেলী ভাষা কৃত্রিম ও অতি নাটকীয় হলেও তার একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণ ছিল, যার ফলে পরবর্তী কবিরা প্রাণপণে এ ভাষা আয়ত্ব করতে ও এই ঢঙ নকল করতে চেষ্টা করেছিলেন। কেদারনাথের সরল ভাষায় মর্মস্পর্শী ভাব জয়যুক্ত হতে প্রায় পঁচিশ বছর লেগে গেল। সে যুগে কেদারনাথ অজানিত ছিলেন কি ? ১৯০২ সালে 'বিজনগ্রাম'

ও 'সন্নাসী' একত্রে ২য় সংস্করণ হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৬তে নবীন সেনের কবিতায় পরিবর্তন এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—

রৈবতক—১৮৮৬/নবীন সেন

পূর্বস্মৃতি ৭ম সর্গ—

'পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গো-পাল
শ্যাম-মকমল সম তৃণ সুকোমলে,
চরিত আপন মনে ; আপনার মনে
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত, ক্রীড়া, হাস্য, মধুর পঞ্চমে,
অনুকরি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত ; ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম, হাসিতাম আনন্দে আমরা।'

—ছয়—

সঙ্গীতময় কাব্যধারা

বিজনগ্রামের আগে ও পরে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতে আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন, তবে সে সম্বন্ধে পরবর্তী পর্যায়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে 'হরিকথা' 'শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ' ও 'বেদান্তাধিকরণমালা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা না

হলেও, তাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এর পর তাঁর অনবদ্য সঙ্গীতপ্রতিভা একদিকে যেমন কাব্য কবিতায় নতুন ছন্দব্যঞ্জনা নিয়ে এল, তেমনি দয়িত ভক্তসত্তা এনে দিল এক ভাবগম্ভীর ফল্গুস্রোত। অবশ্য তাঁর ইংরাজিনবীস বাস্তববাদী মন ক্ষণে ক্ষণে সমালোচনার কশাঘাতের মধ্যেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-রঙ্গরসের সঞ্চার করে তাঁর কাব্যে এক বিচিত্র আস্বাদ এনে দিয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর প্রধান রচনাগুলি হ'ল 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি' ও 'শোকশাতন'। পাঠকের অবগতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কয়েকটি রচনার নমুনা এখানে পরিবেশন করা হ'ল। এখানে ভাবানুগ শব্দচয়নের কারুকৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন সমকালীন অন্য কবিরা সাধু-চলিতের দোটানায় বেশ কিছুটা বেসামাল হচ্ছিলেন, কেদারনাথ তখন সুদক্ষ নাবিকের মত নির্ভুলভাবে দিক ঠিক রেখেছিলেন। গুরুভাবের ক্ষেত্রে তিনি সঠিকভাবে সাধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এবং সমাসবহুল তৎসম শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করলেও, রঙ্গব্যঙ্গের ক্ষেত্রে অনায়াসেই চলিত ক্রিয়া-সর্বনাম প্রয়োগ ও সুঝঙ্কৃত দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে, কি কাব্যে কি গদ্যে কেদারনাথের ভাষা সাধুর কাঠামোতেও সরল প্রাণস্পর্শী প্রাকৃতজনের ভাষা।

ব্রজবুলিতে রচনা অধিক না হলেও উল্লেখযোগ্য ঃ—

পয়ার (১২।১২ মাত্রা)—

তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ॥

চরাওবি মাধব যমুনা তীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥
অঘ বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান॥

(শরণাগতি-২৩)

লঘু পয়ার (১১।১১)—

বরজ বিপিনে যমুনা কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে॥
বনস্পতিলতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখি॥
মলয় অনিল বহয় ধীরে।
অলিকুল মধু লোভেতে ফিরে॥

(শ্রীরাধাষ্টক-৬, গীতাবলী)

লঘু পয়ার (১০।১০)—

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান॥
বরজে বিপিনে সখী সাথ।
সেবন করহুঁ রাধানাথ॥

(শরণাগতি-২৪)

লঘু ত্রিপদী (৭।৭।৯)—

চৌদ্দ ভুবন-মাহ দেব-নর-বানর
ভাগয়া কর বলবান।

নামরস পীযূষ, পিয়ই অনুখন,
ছোড়ত করম গেয়ান।
(শ্রীনামাষ্টক-১ গীতাবলী)

ভাবোদ্দীপক, ভক্ত-আকুতি :—

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—

বিষয়-বাসনাতলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভাঙ্গে স্বর অঙ্গ কাঁপে থরথর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সর্ব্ব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মুর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জরজর॥
(শ্রীনামমাহাত্ম্য-শরণাগতি)

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া,
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥

... ...

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
(উপদেশ-১৮, কল্যাণ কল্পতরু)

পয়ার (১৪।১৪)—
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥

... ...

গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত-স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
(শরণাগতি ২৬)

মিশ্র ত্রিপদী (৬।৬।১২)—
কবে নবদ্বীপে, সুরধনী-তটে,
গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥
(বিজ্ঞপ্তি-শরণাগতি)

রূপবর্ণন ঃ—

লঘু ত্রিপদী (৬।৬।৮)—

ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপ খানি,
হেরিয়া কদম্ব মূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥
(রূপকীর্তন-কল্যাণকল্পতরু)

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—

রাগতাম্বুলিত ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জল-স্পষ্ট,
স্মিত কর্পূরিত নর্ম্মশীলা।
কীর্তিযশ অন্তঃপুরে, গর্ব্ব খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত প্রেমবৈচিত্য মালা॥
(শ্রীরাধাষ্টক-৫, গীতাবলী)

পথনির্দেশ ঃ—

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—

মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য বিধি, সেই আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।
... ...

বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগান,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥
(উপদেশ-১৩, কল্যাণকল্পতরু)

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—
ফোঁটা-দীক্ষা-মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' নিলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি না পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥
(উপদেশ-১৭, কল্যাণকল্পতরু)

ত্রিপদী (৮।৮।১০)—
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর বেশ দেখ যা'র শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি পড় তার পায়॥
(উপদেশ-১৬, কল্যাণকল্পতরু)

বড় সুখের কথা গাই,
সুরভিকুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই।

বড় মজার কথা তায়,
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
(দালালের গীত, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা)

শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির ভাই,
হরিনাম করতে থাক, তর্কে কাজ নাই,
তোমার তর্ক করলে জীবন যাবে,
চাঁদ-বাউল তায় দুঃখী হ'ন।
(বাউল সঙ্গীত -৮, সাধক কণ্ঠমালা)

মন্তব্য ঃ চাঁদ-বাউলের ভণিতায় কেদারনাথ অনেকগুলি রঙ্গ-রসের বাউল গান রচনা করেন। বাউল গানগুলি প্রধানতঃ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত 'সাধক কণ্ঠমালা' থেকে দেওয়া হ'ল। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী বৈভব' গ্রন্থেও গানগুলি আছে।

ভুয়োদর্শন না স্বরূপ প্রকাশ—

'বাউল' 'বাউল' বলছে সবে হচ্ছে বাউল কোনজনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহতত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত।
চিদানন্দ পরমার্থ জানতে ত' তায় পারবে না॥
... ...
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল।
নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ-বাউল আর দেখে না॥
(বাউল সঙ্গীত-৪, সাধক কণ্ঠমালা)

এও ত এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা ॥
দেখতে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন করছেন মামু, সঙ্গে লয়ে পরের বালা ॥
সখীভাবে ভজছেন তারে, নিজে হয়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে, মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥
(বাউল সঙ্গীত-৬, সাধক কণ্ঠমালা)

ভেক ধ'রে চেষ্টা করে,
ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ি, ছড়াছড়ি, আখড়া বেঁধে বাস ;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, করছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
(বাউল সঙ্গীত-১১, সাধক কণ্ঠমালা)

দীর্ঘ পয়ার (১৬।১৬)—

কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটুগাড়ী পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি থাকে ব্রহ্ম আরাধনে ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে।
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥
(৪র্থ প্রভা, প্রেম প্রদীপ)

মধুরেণ সমাপয়েৎ ঃ—

পয়ার (১৪।১৪)—

বেলা হ'ল, দামোদর আইস এখন।
ভোগ মন্দিরে বসি করহ ভোজন ॥

৪

বাউল বাউল বল্‌ছ সবে হচ্ছে বাউল কোন জনা।
দাড়ী-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে
বঞ্চনা॥ দেহতত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব তাতে কি ছাড়ায়
মায়ার গর্ত্ত, চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌লে ত' তা' আর
পারবেনা॥ যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে
চল ধর্ম্মপথে, যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়রে
মনের বাসনা॥ বেশ-ভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে
হওরে রত, নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি'
সব দুর্ব্বাসনা॥ মুখে হরে কৃষ্ণ বল, ছাড়রে
ভাই কথার ছল, নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ
বাউল ত আর দেখেনা॥

কেদারনাথ দত্তের হস্তাক্ষর

(১৮৮১)

নন্দের নিদেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব সহ সখা বৈসে সারি সারি॥
শুকতা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডালনা দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট॥
মুদ্গবড়া মাসবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন॥
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরি লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী॥
... ...
হরি লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ॥
(ভোগ-আরতি, গীতাবলী)

—সাত—

কেদারনাথ ও সমকালীন কাব্য

ইতিপূর্বে কবি কেদারনাথের নানা ভাবের কাব্যসৃষ্টির কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। এবারে তাঁর সমকালীন ও কিছু পূর্ব যুগের

রচয়িতাদের রচনা থেকে প্রায় সমভাবের রচনার কিছু কিছু অংশ এখানে দেওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু ভিন্ন অন্য সকলেই কবি হিসাবে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত। তবে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণের রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত, রঙ্গকবিতা ও দেশাত্ম-ভাবোদ্দীপক কবিতা সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সুতরাং তাঁদের সুপরিচিত কিছু কাব্যাংশ এখানে অন্তর্ভূ'ত করা হ'ল। মাইকেল মধুসূদন মহাকবি, কেদারনাথ নিজেই তাঁকে সে যুগের 'সাহিত্যসূর্য্য' বলেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত স্বভাব কবি, তার মর্মে মর্মে রঙ্গরস ভরা। কেদারনাথের পরিণত বয়সে রবীন্দ্র প্রতিভা বাংলার সাহিত্য গগন উদ্ভাসিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যসেবী, তুলনায় তাঁর জীবনের অন্য সব কাজই নগন্য। অতএব, যেহেতু বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তুলনাহীন, তাঁর রচনার কোন উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হয়নি।

কেদারনাথ জাত-সাহিত্যিক হলেও নিষ্ঠুরভাবে সাহিত্যসৃষ্টিকে নিজের জীবনে গৌণ করে অন্যপথ বেছে নিয়েছেন—সে পথ গৌরদর্শনের, ধর্মতত্ত্বের পথ। তিনি সাহিত্যসৃষ্টিকে তাঁর ভক্তিমার্গে চলার অবলম্বন স্বরূপ যষ্ঠিতে পরিণত করেছিলেন। আর, তাঁর ফেলে যাওয়া ওই যাদু -যষ্ঠি আজ বহু সহস্র দৃষ্টিহীন বৈষ্ণব ভক্তের একমাত্র পথ-নির্দেশক অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজিয়ার চোরাবালি ও বিধিভক্তির খানাখন্দ এই যষ্ঠিস্পর্শে চিনতে পেরে আজ আর্তিবানেরা শুদ্ধভক্তির পথে চলতে চেষ্টা করতে পারছেন। একথা এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের পরিচিত রচনাকে মান হিসাবে

ধরার জন্যই সে সব থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল। এই রচনাগুলি স্বীকৃত সাহিত্যকর্ম হয়ে থাকলে তুলনায় কেদারনাথের রচনাগুলিকেও সাহিত্যসৃষ্টি বলা যায় কিনা তা পাঠকই বিচার করবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সহজিয়া পাঁকের দুর্গন্ধে শিক্ষিত প্রাজ্ঞ সমাজ এতই বিরক্ত হয়েছিলেন-যে তাঁদের সকলেই তদানীন্তন বৈষ্ণব সংস্পর্শের আভাষমাত্রকেও এড়িয়ে গেছেন। কেদারনাথ নিজেই যে সহজিয়ার নরক থেকে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মকে তুলে পাঁকমুক্ত করতে লেগে গিয়েছিলেন, সে কথা শোনার ধৈর্ব বা বিরূপতামুক্ত মন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় কারও ছিল না। শুচিবায়ুগ্রস্থ সমাজ সহজিয়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে গিয়ে ভুল করে কেদারনাথকেও বাতিল করে দিলেন। নতুন নবদ্বীপ শহর ভিত্তিক সহজিয়া গোষ্ঠীর ধর্ম-ব্যবসায়ী কিছু লোক যথাসাধ্য কেদারনাথের সমস্ত চেষ্টাতেই বাধা সৃষ্টি করলেও, শিক্ষিত সমাজ সেকালে কেদারনাথ সম্বন্ধে একটা উপেক্ষার শীতল নীরবতা বজায় রাখল। ফলে বর্তমান শতাব্দীতে সাহিত্য ও সমাজ ইতিহাসবেত্তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যভাণ্ডার সন্ধানকালে সে যুগের কোন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের উল্লেখের অভাবে কেদারনাথের বা তাঁর রচিত সাহিত্যের সন্ধানই পেলেন না। দুর্ভাগ্য আমাদের, কেদারনাথ অনাবিস্কৃত রয়ে গেলেন।

এরপর পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত কেদারনাথের রচনার প্রায় সমভাবাপন্ন অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কিছু রচনা তুলনার জন্য এখানে দেওয়া গেল।

ভাবোদ্দীপক ও ভক্ত-আকুতি ঃ—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

ললিতা—১৮৫৩ :

'চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী।
উষার প্রখর তারকা ধনী।
চলিল গজেশগামিনী ॥
উভয়ে মরেছে হৃদি যাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে।
কাঁধে কাঁধে ধরি চলে কাননে।
গভীর নীরব যামিনী ॥'

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—১৮৬১ :

'কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ॥
মধু—যার মধুধ্বনি, কহে কেন কাঁদ ধনি,
ভূলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ॥'

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—১৮৭৩ :

'গাও ভারতের জয় ॥

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা ॥
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত ললনা ॥
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ ॥'

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)

সারদামঙ্গল : ১ম সর্গ—১৮৭৯ :

এস মা করুণারাণী
ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;
শুন সে উদার কথা
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার !
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন তপোবন-স্থলে।'

রূপদর্শন :—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৮-৮৭)

শূরসুন্দরী : ৩য় সর্গ—১৮৬৮ :

'কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট।
নভূত নভাবী কীর্ত্তি করিল সম্রাট॥
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম-কাননে।
কুসুম সময়ে হাসে প্রফুল্ল আননে॥
কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাটি।
শূন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী॥'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯২২)

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—১৮৮৬ :

'নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী-মোহন তান।
কুসুম ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী প্রাণ॥'

পথনির্দেশ :—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)

কবিতাবলী—১৮৩০-১৮৫৫ ? :

'মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥'

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মিনী উপাখ্যান—১৮৫৮ঃ

'স্বাধীনতা হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খলবল
কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা
নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা
স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায় ॥'

ভূয়োদর্শন না স্বরূপ প্রকাশ ঃ—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরহিনীর দশ দশা—১৮৭৩ঃ

প্রথম দশা দিনে, বেড়ি বেড়ি রোওল,
শেজে পড়ি কাঁদে ভূমিলুটি।

দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখি মেলি হেরল,
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গিল উঠি ॥

… … …

সপ্তম দশা দিনে, সজনা খাড়া রাঁধিল,
বলে প্রাণ বঁধু কোথা গেলে।
যে খাড়া রেঁধেছি ভাই, তুমি বঁধু কাছে নাই,
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে ॥'

দুর্গোৎসব—১৮৫৪ :

'বর্ষে বর্ষে এসে যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা মৃগেন্দ্রবাহিনী ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিঠে হ'ল খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী ॥'

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

ব্রহ্মসঙ্গীত—১৮২৮ :

'কে ভুলালো হায়,
কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে, তাকে

কেমনে ঈশ্বর ডাক, কর অভিপ্রায় ?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার ;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেকে করহ সংহার।'

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮)

ফুলরেণু—১৮৯৬ :

'ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মরলে—
তোমারা আমার চিতেয় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকিয়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি করি ছটফট—
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে,
তোমরা আমার চিতেয় দিবে মঠ।'

লালন ফকির (১৭৭৫-১৮৪৫)

'বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা তারাই নদীর ধারা চিনে॥'

অজ্ঞাত বাউল (১৯শ শতাব্দী)

'যাচ্ছে গৌর-প্রেমের রেলগাড়ী।
তোরা দেখসে আয় তাড়াতাড়ি॥ ...
... ...

গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনীয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর।
মুখে হরি হরি, গৌরহরি
করবেন টিকিট মাষ্টারী ॥'

পঞ্জ শাহ (১৯শ শতাব্দী)

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে
পাবি ওরে মন পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতাল্লা বিষমলীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা ॥
কতজন জপে-মালা তুলসীতলা।
আর কতজন হরি বলে মারে তালি,
নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ॥'

মধুরেণ সমাপয়েৎ ঃ—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পৌষ পার্বণ—১৮৪০

'সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি র াঁধে ॥
কত থাকে তার কাঁচা, কত যায় পুড়ে।
সাধে র াঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ॥
... ...

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
পড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার॥
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁঠালের গুঁড়িপ্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বসে।
চিঠে ছিটে দিয়ে পিঠে খান কসে॥'

মন্তব্য ঃ কত অজ্ঞাত কুলশীল বাউলও সাহিত্য ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, কিন্তু ভক্ত রসিক 'চাঁদ-বাউল'-এর (কেদারনাথের) স্থান হয়নি। গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের রসসৃষ্টির তুলনা নেই, কিন্তু কেদারনাথের ভোগারতির ভোজ্যতালিকা তাঁকেও হার মানিয়েছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে ওপরের কাব্যাংশগুলিতে গুরুচণ্ডালী ও ছন্দপতন মাঝে মাঝে চোখে পড়বে, কিন্তু কেদারনাথের রচনায় এ ব্যাপার কখনও ঘটেনি। কেদারনাথের কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা এখানেই শেষ করা হ'ল।

—আট—

গদ্যসাহিত্য

কেদারনাথ দত্তের বাংলা গদ্য সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—রম্যসাহিত্য, সমালোচনাসাহিত্য ও ধর্মসাহিত্য। ইচ্ছাপূর্বক বিনোদনসাহিত্য রচনা না করলেও, বর্ণনার মাধুর্যে ও শব্দ-

চয়নের গুণে তাঁর বেশ কিছু স্মৃতিচিত্র রম্যরচনায় পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম সাধুর কাঠামোয় রাখলেও তৎভব ও দেশজ শব্দের সুললিত সমাবেশে এ ঘরোয়া রচনা আজও স্বাদু রসের পরিবেশক। তবে তাঁর বিশাল অবদান প্রধানত ধর্মসাহিত্য ক্ষেত্রকেই পরিপুষ্ট করেছে। বিনোদন-সাহিত্য পিপাসু সাধারণ পাঠক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় রচনাকে সাহিত্য পদবাচ্য মনে করেন না, ফলে এ জাতীয় রচনা বহুক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়। কেবলমাত্র, ধর্মের কাঠামোয় অলৌকিক কাহিনীই সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করে। কিন্তু ধর্মসাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের অর্ঘ্য গ্রহণ করা যায় তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দলাভ কর না।...সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম।...অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্যকে ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।' ('ধর্ম্ম ও সাহিত্য'/ ১৮৮৫-বিবিধ প্রবন্ধ)। কেদারনাথ আজীবন সাহিত্যকে এ ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

রম্যসাহিত্য

কেদারনাথের রম্যসাহিত্যের সন্ধান প্রধানতঃ আত্মজীবনচরিতেই (১৮৯৬?) মেলে। তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে রঙ্গরসে জারিয়ে লিখেছেন (পৃঃ ৩৩-৩৫)—

'এই বয়সেই (৮ বছর) আমি অনেকটা স্বাধীন।...যাহার বাটীতে

যে উৎসব হয়, আমি দেখিতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাটীতে অনেক পূজা হয়। ...তান্ত্রিক মতে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘোরে থাকিত। কেহ কেহ বলিত যে দুধ-গঙ্গাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা নাবাইয়া জল দিয়া দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন হাসি দেখিতে পাই নাই।'

আত্মজীবনচরিতে অন্যত্র লিখেছেন (পৃঃ ২৫-২৬)—'এক বৃদ্ধ কলু ...মরণ আসন্ন হওয়ায় সে (কথক-ব্রাহ্মণের দ্বারা) মহাভারত পাঠ করাইত।...এক এক দিন কথকের অনেক খাদ্যদ্রব্য লাভ হইত। সেইদিন কথক বড়ই প্রফুল্ল থাকিতেন। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেইদিন তাঁহার মনটা ভারী হইত।'

সমাজের আর একটি রঙ্গচিত্র—

'গ্রামটা আমোদপূর্ণ ছিল।...মস্করামী করিতে সকলেই মজবুদ। সুতরাং অনেকেই 'পাগল' উপাধি লাভ করিতেন। ঈশে পাগলা, গঙ্গা পাগলা, পেশা পাগলা, শম্ভো পাগলা—এরূপ নামে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক পরিচিত ছিলেন। বারওয়ারী পূজা রক্ষা করিবার জন্য উঁহারা দেশ-বিদেশ হইতে বাক্‌চাতুরী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন' (আ, জী, চ, পৃঃ ৩৬)।

বাঙলার গ্রাম্য জীবনে উৎসবের কয়েকটি জীবন্ত চিত্র কেদারনাথ বাল্যস্মৃতি বিজড়িত উলাগ্রাম থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন (আ, জী, চ, পৃঃ ৮-১০, ২২-২৪)—জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্র আমার বেশ মনে পড়ে। পূজার বাটীতে শত শত ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গান হইত। অনেক দ্বারবান, পেয়াদা ও সেপাই পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। রাণাঘাট,

শান্তিপুর হইতে অনেকানেক পেটমোটা বাবুরা জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন। লোকে লোকারণ্য, আলোতে কুরুক্ষেত্র ; বাজি প্রভৃতি ধূমধাম ভারি ছিল। প্রথম রাত্রে ক্ষেমটা ও বাইনাচ হইত,-···অধিক রাত্রে কবিগান হইত। ···কালীপূজার রাত্রে পূজাটা বড় জাঁকের সহিত হইত। মনুষ্যদিগের জাঁক ছিল, কিন্তু পাঁঠাদিগের সর্ব্বনাশ। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পাঁঠার লোভে উপস্থিত হইতেন···গ্রামে চৌদ্দশত ঘর ভাল ব্রাহ্মণ ; কায়স্থ-বৈদ্য ও অনেক ছিল। গ্রামের লোকের অন্নাভাব ছিল না ; তখন অল্পেসল্পে নির্ব্বাহ হইত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া গান, বাদ্য ও গল্পাদি করিয়া বেড়াইতেন। ···কলাবতী গান ও তম্বুরা-শিক্ষায় প্রায় সকলেই পটু ছিলেন। কোন স্থানে পাশা বা দাবা খেলিতেন। গ্রামটা আনন্দমগ্ন ছিল।'

'দুর্গোৎসবে বড়ই মজা হইত। অষ্ট-ধাতুর জগত্তারিণী ঠাকুরাণীটী সুবৃহৎ মন্দিরে সর্ব্বদিন পূজিত হইতেন। দুর্গাপূজার সময় তাঁহাকে পূজারবাটিতে আনা হইত।··· ৩০জন পশ্চিমে ব্রাহ্মণ দ্বারবান ঠাকুরাণী-কে বহন করিয়া মন্দির হইতে পূজার দালানে বসাইত। তিন দিবস খুব পূজার ধূমধাম। ষষ্ঠীর দিবস হইতে ঢাক ঢোলের আওয়াজে পূজার বাটি কম্পিত হইত। নবমী দিবসে অনেক পাঁঠা ও মহিষ বলিদান হইত' (পৃঃ ৯-১০)।

এর পর আসছে উলাচণ্ডীর (ওলাই চণ্ডীর) উৎসব। বর্ণনাটি এই রকম,—'গ্রামের এক পার্শ্বে উলাচণ্ডীতলা। সেখানে অনেক বটগাছ ছিল। একটী উচ্চ বেদীর উপর সিন্দুঁর মাখা একখানা প্রস্তর খণ্ডকে উলাচণ্ডী বলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাচণ্ডীর পূজার বড় ধূমধাম।

সেই সময় দুই পাড়ায় দুই বারোওয়ারী পূজা হইত। একখানির নাম মহিষমর্দ্দিনী।…এত লোক হইত যে পথে চলিতে ভীড় হইত। নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে হাতী ও মহিষের লড়াই একটি আনন্দ-জনক ব্যাপার ছিল। অনেক স্থান হইতে অনেক হাতী আনা হইত, মুখোপাধ্যায়দিগের একটি প্রকাণ্ড মহিষ ছিল। সেই মহিষটার শৃঙ্গ লৌহ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত, বড় বড় হাতীর দাঁতে লোহা বাঁধা যাইত। অগ্রে ঘোষণা দিয়া মহিষ ও হাতী গ্রাম মধ্যে ছাড়িয়া দিত। কোন সময় মহিষটা প্রবল হইয়া হাতিদিগকে তাড়াইয়া যাইত। কখনও বা কোন হাতি প্রবল হইয়া মহিষকে কাবু করিয়া আনিত। আমরা দোতলা ছাদ হইতে ঐ সকল দেখিতাম' (পৃঃ ২২-২৩)।

এ ছাড়া সেকালের সমাজ জীবনের অনেক ঐতিহাসিক চিত্রই আমরা কেদারনাথের আত্মজীবনচরিত থেকে পাই। সুতরাং হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে আরও দু-একটি চিত্র এখানে উদ্ধার করা যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে অনেকেই সেকালের পাঠশালার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু এমন রস-ঘন কৌতুককর চিত্র কি আমরা কোথাও পেয়েছি !—

'পাঠশালাটি আমার মাতামহের পূজার বাটীর সুদীর্ঘ অলিন্দে স্থাপিত ছিল।…প্রাতে ও অপরাহ্ণে পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে হইত। গুরুমহাশয় প্রত্যুষেই বসিতেন। পাড়ার অনেক ছেলে আমাদের সহিত পড়িত ও লিখিত। তাহাদের মধ্যে যে যে কিছু বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা গুরুমহাশয়ের দূত স্বরূপে আমাদের উপর পীড়ন করিত। আমাদের পাঠশালায় আসিতে বিলম্ব হইলে তাহারা আমা-দিগকে ধরিয়া আনিত। পাঠশালার এই নিয়ম ছিল যে যিনি প্রথমে

উপস্থিত হইতেন তিনি একছড়ি খাইতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই ছড়ি, তৃতীয় ব্যক্তি তিন ছড়ি, এইরূপ ছড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি হইত। সদ্দার পড়ুয়াকে গুরুমহাশয় ছড়ি মারিতেন। সে আর সকলকে মারিত। পাঠশালা হইতে কোন কার্যের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইলে থুথু ফেলিয়া যাইতে হইত। পাঠশালায় লেখাপড়ার প্রণালী এরূপই ছিল। অত্যন্ত শিশু ছাত্রগণ তালপাতায় কয়লার কালীতে ক খ ইত্যাদি লিখিত। যাহারা এক বৎসর লিখিয়াছেন তাহারা কলাপাতে অঙ্ক কসিতেন এবং কাগজ পত্রে নকল করিতেন। পরিপক্ক বালক সকল জমিদারী সেরেস্তার জমা-খরচ লিখিতে শিক্ষা করিতেন। ছোট ছোট বালক নালিশ করিলে সাক্ষী সাবুদ লইয়া তাহাদের মোকদ্দমা বিচার হইত। অবশেষে দণ্ডবিধান হইত। সমস্ত হুকুমেই গুরুমহাশয়ের মঞ্জুরি লইতে হইত। দণ্ড অনেক প্রকার ছিল। কান মোলা, চড়, বেত, নাড়ুগোপাল, জরিমানা এই সমস্তই দণ্ডরূপে প্রদত্ত হইত। আমরা গুরুমহাশয়কে যমস্বরূপে দেখিতাম। সদ্দার পড়ুয়াদিগকে যমের কর্ম্মচারীরূপে বিচার করিতাম। সদ্দার পড়ুয়ারা কখন কখন আপনা হইতে এবং কখন কখন গুরু মহা-মহাশয়ের ইচ্ছামতে মকোদ্দমা প্রস্তুত করিত। কোন বালকের দ্বারা নালিশ করাইয়া অকারণ মিথ্যা সাক্ষীদিগের বাক্যে অন্য বালকদিগকে দণ্ড দিত। সুতরাং আমরা কোন প্রকারে নিস্তারের পথ না দেখিয়া সদ্দার পড়ুয়াদিগকে সন্তোষ রাখিবার যত্ন করিতাম। পাঠশালা ছুটি হইবার সময় সদ্দার পড়ুয়া বলিয়া দিলেন—দেখ কেদার! কল্য প্রতে গুরুমহা-শয়ের তরকারী নাই। বাটী হইতে যাহা পাও তাহা আনিবে। আমি এক দিবস বাটির ভিতর হইতে একটি ছোট এঁচোড় চুরি করিয়া আমার

পাততাড়ির ভিতর করিয়া সদ্দার পড়ুয়ার দ্বারা গুরুমহাশয়কে দিলাম। গুরুমহাশয় আজ্ঞা করিলেন এই ছোঁড়ারই বিদ্যা হইবে। এঁচোড়টী ঘরে উঠিল। এমত সময় আমার ঝি আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গুরুমহাশয়ের ঘর হইতে এঁচোড়টী লইয়া গেল। আমার মাতাঠাকুরাণী ক্রোধ করিয়াছেন শুনিয়া গুরুমহাশয়ও ভীত হইলেন। আমাকে বলিলেন তুমি আর কোন জিনিষ যাহা নজরে না পড়ে আনিয়া দিবে। বড় বড় জিনিষ আনিবে না। পাড়ার ছেলেরা তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দিত। আমার পিতার বৈঠকখানায় চাকরেরা তামাক চাবি দিয়া রাখিত। আমি ছোলা ভিজে চুরি করিয়া গুরুকে দিতাম। আমার ভাই হরিদাস গুরুমহাশয়ের উপর বড় চটা ছিল। সে সদ্দার পড়ুয়াদিগের দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া একদিন একখানা দা লইয়া গুরুমহাশয় যে ঘরে আহারান্তে নিদ্রায় ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি হঠাৎ সেই সময় উপস্থিত হইলে হরিদাস দা খানি ফেলিয়া দিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় নিদ্রাভঙ্গে ঐ সকল কথা শুনিয়া নিজ কার্যে ইস্তফা দিয়া সেই দিনই বাটী চলিয়া গেলেন। কাযে কাযেই আর একজন ব্যক্তিকে গুরুমহাশয় পদে নিযুক্ত করা হইল। এইরূপ দুইটি বা তিনটি গুরুর নিকট পড়িতে পড়িতে আমার কাগজ লেখা আরম্ভ হইল।' (আ, জী, চ, পৃঃ ৮-১৪)।

কেদারনাথ নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় নামের বকলমে সজ্জনতোষণী পত্রিকার ৮ম খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১১শ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে 'অবতার বিষকিষণ'-এর যে সত্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি, লেখার মুন্‌শীয়ানায় ও কথোপকথনের কলাকৌশলে একটি রহস্যঘন রচনায়

পরিণত হয়েছে। সেই দীর্ঘ কাহিনী এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলে আত্মজীবনচরিতে দেওয়া সংক্ষিপ্ত রূপটিই দেওয়া হ'ল (পৃঃ ১৩৬-১৩৮),—

'উড়িষ্যায় জগন্নাথ দাসের একটি দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে, জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায় মহাপ্রভু তাহাকে 'অতিবাড়ী' বলিয়া ত্যাগ করেন (১৫২৫-২৬?)। (পরবর্তী) অতিবাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউল দলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলি জাল পুঁথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, চৈতন্য আবার প্রকাশ হবেন। সেই অছিলায় কয়েকজন দুষ্ট লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বলদেব, কেহ কৃষ্ণ—এইরূপ উদয় হইতে লাগিল (১৮৭০-৭১)। বিশকিসন নামক একজন খণ্ডাএত (খোন্দজাতি—উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের এক উপজাতি) কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিরা প্রকাশ করিল। শরদাইপুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলে সে আপন দলবল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে (তত্ত্বপত্রে) লেখাইয়াছিল,—'মহাবিষ্ণু বিশকিসন গুপ্তরে অছি নাহি জানে আন, ১৪ই চৈত্রেরে হব রণ'; তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভূজ দেখাইবেন। এই কথা প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণীসকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরী রমণীদের কোন বিভ্রাট (মহাবিষ্ণুর পূর্ণিমা রাতে তাদের নিয়ে রাসনৃত্য করার চেষ্টা) হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিসনার রেভেন্স সাহেবকে জানায়।···ওয়ালটন সাহেব

(তখনকার পুরী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট) আমাকে পাঠাইলে (কেদারনাথ তখন এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) আমি রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া মহাবিষ্ণুর সহিত কথোপকথন করিলাম।...(বিশকিসনকে গ্রেপ্তার করার পর) পুরী গিয়া মহাবিষ্ণুর বিচার আরম্ভ হইল। অনেকদিন বিচারের পর আমি তাহাকে দেড় বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিষকিষণ কথাটির বানান আত্ম-জীবনচরিতে বিশকিসন আছে ও সজ্জনতোষণীতে বিষকিষণ আছে। সুতরাং এখানে যেখানে যেমন আছে তেমনি রাখা হ'ল।

মূল 'অবতার বিষকিষণ' কাহিনীতে (স, তো, ১৮৯৬, ৮।৬-১১ সংখ্যা) পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কেদারনাথের সঙ্গে ভণ্ড অবতার যোগী বিষকিষণের যে কথোপকথন আছে তার রসসিক্ত 'সেয়ানে সেয়ানে কোলা-কুলির' মত কৌতুকময় ভাষা কিছুটা এখানে তুলে ধরা হ'ল (স, তো, ৮।৭।২০৬-২:২),—

'ডেপুটীবাবু প্রণাম করিলে...যোগী কহিলেন,—'বাবু! তুমি বাঙ্গালী ও সরকারের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, তুমি কি মানসে এই রাত্রিকালে এখানে আসিলে?'

ডে। আপনার নাম বহুদূর প্রসারিত হইয়াছে, সেই নামের আকর্ষণে আমাকে এখানে আনাইয়াছে।

যো। তবে তুমি আমার ভক্ত? আমাকে ভক্তি উপহার দিতে আসিয়াছ তাহাই বল? ভাল, ভাল, আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিছু উপদেশ শুনিবে?

ডে। আজ্ঞা করুন।

যো। তুমি যখন আমার ভক্ত·· তখন আমার উদ্দেশ্য তোমায় কিছু বলা আবশ্যক।···আমি ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান ছিলাম। হিন্দুদের উপর ম্লেচ্ছগণ বড় অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া, মনু আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অবতরণ করাইয়াছেন। আমি শীঘ্রই ম্লেচ্ছ নিধন করিব। এই দেখ এই মালিকা সর্বত্র প্রচার করিয়াছি।

এই বলিয়া বিককিষণ একখণ্ড তালপত্র ডেপুটীবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল,—

'বনেরে অছি বিষক্ষিষণ। গুপ্তেরে অছি ন জানই আন॥

১৩ মীনরে আরম্ভিব রণ। চতুর্ভুজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ॥'

পাঠ করিয়া ডেপুটীবাবু কহিলেন,—'উত্তম তাহাতে কি হইবে?'

যো। আবার ভারতকে হিন্দুরাজ্য করিব।···তোমাকে একটি বিশিষ্ট পদ দিব। এমত ভরসা করি, তোমাকেই উড়িষ্যার শাসনের ভার দিতে পারিব। কেমন, তুমি শাসন করিতে প্রস্তুত আছ?

ডেপুটি বাবু মনে মনে কহিলেন 'এরূপ প্রলাপ মন্দ নহে।' প্রকাশ্যে কহিলেন—'শ্রীভগবান করাইলে কে কি না করিতে পারে। মহাশয়ের ইচ্ছাতেই তো সব হইতেছে।'···

যো। ভাল, ভাল, তুমি আমার খুব ভক্ত দেখিতেছি।···অবশ্য এখন আমার কথা সব গোপন রাখিবে।···

ডে। শ্রীপুরীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেব বিরাজ করিতেছেন, সে স্থান ত্যাগ করিয়া এ অরণ্যে আশ্রয় করিয়াছেন কেন?

যো। পুরীতে লোকে কাঠ লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছে, যথার্থ

ঈশ্বরকে (আমাকে) জানে না, এই জন্য এই স্থানে আত্মপ্রকাশ করিব।

যোগীর প্রগল্‌ভতায় ডেপুটিবাবু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—'আপনি মহাপ্রভুকে জানেন কি ?'

যো। হাঁ, নবদ্বীপে তাহার বাড়ী ছিল, সন্ন্যাসী হইয়া পুরীতে আসিয়া বাস করে, সে আমার ভক্ত ছিল। তুমি যেমন আমার ভক্ত। ···আমি লোকের প্রত্যাশা করি না—মহাবিষ্ণু মনুষ্যের শক্তির ভিখারী নয়—নিজেই যথেষ্ট শক্তিমান।

ডেপুটিবাবু দেখিলেন···যোগীর ঈশ্বর হইবার লালসা খুব প্রবল। দুর্ব্বুদ্ধি মানব এইরূপেই আপনার অধঃপতন আপনি ডাকিয়া আনে ! তিনি···হাসিয়া বলিলেন,—'প্রণাম—তবে আজি বিদায় হই। ইতিমধ্যে আর একদিন আসিয়া মহাবিষ্ণুর শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইব।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে কথোপকথনে চলিত ভাষার প্রচলন করার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে (১৮৬৫)। কিন্তু সেখানে বহু ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালী দোষ থেকে যায়। বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলেছিলেন—'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।' ('বঙ্কিম প্রসঙ্গ'—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭১)। আবার পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বঙ্কিমী ভাষাকে 'শবপোড়া মড়াদাহ' বলে বিদ্রূপ করেন। আগে দেওয়া কেদারনাথ রচিত কথোপকথনের পর এবার বঙ্কিমচন্দ্রের রঙ্গরসসিক্ত একটি কথোপকথনে রচনার (১৮৮৫) উল্লেখ করা যাক ('রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদান'—বিবিধ প্রবন্ধ)—

'আমি বাবাজীর চেলা,···একদিন বাবাজীর সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।···বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার হরি কোথায় বাবাজী ?'···বাবাজী বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন—'হরি কোথায় ! তা আমি কি জানি !'··

বাবু। তবু তাঁর একটা থাকবার যায়গা কি নাই ? হরির একটা বাড়ী ঘর নাই ?

বাবাজী। আছে বৈ কি। তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কতদূর বাবাজী ?

বাবাজী। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর।

বাবু। নিকটে তবে কা'র ?

বাবাজী। যাহার কুণ্ঠা নাই।

বাবু। কুণ্ঠা কি ?

বাবাজী। বুঝেছি কালেজের সাহেবেরা টাকাগুলো ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন অভিধান খোল।

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। একজন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। অভিধান তোমার কখন ছিলনা, একথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন ?

বাবু। অহো সেই কুণ্ঠা ! কুণ্ঠা—কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ ? এমন স্থান কি আছে ?

বাবাজী। বাহিরে নাই—ভিতরে আছে।

বাবু। ভিতরে—কিসের ভিতরে ?

বাবাজী। মনের ভিতরে।

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়— কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন ?

বাবাজী। কুণ্ঠাশূন্য নির্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে তাঁহার বাসস্থান—এইজন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ।'

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এখানেও গুরুচণ্ডালী দোষ এড়াতে পারেননি, সাধুর কাঠামোয় মাঝে মাঝে চলতি ঢুকে পড়েছে। এই কথোপকথনে 'থাকবার', 'কা'র' ও 'বুঝেছি' লক্ষণীয়।

এখানে সমকালীন লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০) 'হুতোম পেঁচার নকশা' (১৮৬২-৬৫) থেকে তুলনীয় সহজিয়া গোঁসাইদের একটি চিত্র দেওয়া গেল—

'হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার-বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে উঠবার যো নেই! গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক তুর্ল্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালীয়দমন, পুতনাবধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি—গোছালো লীলাগুলি করে থাকেন।' প্রসঙ্গতঃ কেদারনাথের বাউল রচনায় 'এও ত এক কলির চেলা' ('ছয়' অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) 'সংসার' উপন্যাসে 'শারদীয়া পূজা'র সমাজচিত্রও কৌতূহলোদ্দীপক (১৮৮৬)—

'আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের

বড় আমোদ। নূতন কাপড় হইবে, নূতন জুতা হইবে ··ইস্কুলের ছুটি হইবে। গৃহস্থগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন···। কেহ বড় তত্ত্ব আশা করিতেছেন, পাশ করা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী ঘড়ীর চেন্ খারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ী আদায় করিয়াছেন।···বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচগানের ভালরকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব ? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ?'

এর পরে কেদারনাথের সমালোচনা সাহিত্যের কথা বলা যাবে।

—নয়—

আলোচনা-সমালোচনা

কেদারনাথ তাঁর দীর্ঘায়ু পত্রিকা 'সজ্জনতোষণী'র সম্পাদনাকালে আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেছিলেন। যদিও তাঁর দৃষ্টি প্রধানতঃ ধর্মন্যস্ত ও ভাবগম্ভীর, কিন্তু তার মধ্যেও বেশ কিছু প্রবন্ধ কখন রসসিক্ত, কখনও বা শাণিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা কষায়িত ছিল। তবে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এই যে বক্তব্যের ভাষা ছিল সর্বক্ষেত্রেই বিষয়ানুগ।

একটি সর্ব-ধর্মজ্ঞ বিচিত্র কলকাতার বাবুচরিত্র সৃষ্টিতে তিনি লিখলেন,—'যোগী-বাবাজী···তমাল বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনটি বঙ্গদেশীর ভদ্রলোক আসিতেছেন।··তিনজনের একটি বয়সে বিজ্ঞ, গোঁফ ও চুল প্রায় সকলই শুভ্র হইয়াছে। গায়ে একটি মলমলের পিরাণ, পরণে ধুতি-চাদর, হাতে ব্যাগ ও পায়ে চিনের বাড়ীর জুতা।···বিজ্ঞ বাবুটি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী-বাবাজীর আশ্রমে যাইব। তাঁহাকে অগ্রেই··· পত্র লেখা হইয়াছে।" যোগী কহিলেন—"আপনি কি মল্লিক মহাশয় ?" বাবু কহিলেন—"আজ্ঞা হাঁ।" বাবাজী যত্নপুর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন!

··স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া·· ভোজনান্তে মল্লিকবাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়া কহিলেন,—"আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই। কলিকাতায় আজকাল পুরাতন ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে···। এখন নির্জ্জনে আপনকার চরণরেণু স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। আমার ইতিবৃত্ত এই যে—প্রথম বয়সে আমি সন্দিহান ছিলাম। পরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।···পরে রামমোহন রায় প্রচারিত অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম-অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিছুদিন হইল বিলাতী ভূতবিদ্যা 'ক্লেয়ারভয়েন্স' ও 'মেসমেরিসম্' নামক সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করি।···আমার এই সমস্ত ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দ দাস বাবাজী একদিন বলিলেন—বাবু! যদি গোবর্দ্ধনস্থ যোগী-বাবাজীর নিকট আপনি যাইতে পারেন, তবে অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন

করিতে পারেন। সেই সময় হইতে আমি হিন্দু-শাস্ত্রে গাঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছি।...আমি এখন অনেক হিন্দু-ব্রত করিয়া থাকি। গঙ্গাজল পান করি।...প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করি।" (প্রেম-প্রদীপ, ৩য় প্রভা/১৮৮৬)।

উপরোক্ত বাবুর যোগী-বাবাজীকে প্রণাম করার ইচ্ছা, কিন্তু যেহেতু কলকাতায় এই 'পুরাতন ব্যবহার' আর প্রচলিত নেই, তাই তিনি স্নান-ভোজন অন্তে নিরিবিলি লোকচক্ষুর অন্তরালে যোগীর 'চরণ-রেণু-স্পর্শসুখ' অনুভব করলেন। তিনি আবার মহাভোজে পর পর ব্যঞ্জন আস্বাদনের মত টপাটপ একটার পর একটা ধর্ম গ্রহণ করে চলেছেন। বেশবাসের চাকচিক্কণও কম নয়।

এইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে চিত্রিত (১৮৭২-৭৩) অপূর্ব সরস 'বাবু' চরিত্রটিকে ('লোকরহস্য') একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক,—'যাঁহারা বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী....বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয়,... চিত্রবসনাবৃত...মাতৃভাষা-বিরোধী, তাঁহারাই বাবু।... যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী,...যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু।...যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রহ্ম-ধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাশানেল থিয়েটার', তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু।'

কেদারনাথ মানব জীবনে প্রীতির মাধুর্য ও তাৎপর্য আলোচনায় বলেছেন (স, তো, ৮।৯/১৮৯৬),—'প্রীতি, এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটি তীব্র

মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

'প্রীতিই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয় সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয় তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না; স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।'

একই বিষয়ের ওপর বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন (ধর্মতত্ত্ব-২১শ, প্রীতি/ ১৮৮৬),—'প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ ও সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার, বা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলি প্রীতি সংসর্গজ যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন।…যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই তাহাই প্রীতি।…পরপ্রীতি অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা।… এইজন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত

শাসিত না হইলে প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী যেখানে সুললিত ও সুরসিত, কেদারনাথ সেখানে ক্ষেত্রানুগ—কোথাও না হেসে হাসিয়েছেন, কোথাও বা পরম গাম্ভীর্যময়। কেদারনাথের প্রকাশ-প্রয়োগ ভাবকে একান্তভাবে তুলে ধরেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রসপ্রধান রচনায় ভাব আধারমাত্র, রসসৃষ্টিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই জন্যই কেদারনাথের পাঠক ব্যষ্টিভুক্ত, আর বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক সর্বসমষ্টি।

কেদারনাথ নিজে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠায় আজীবন নিজেকে উৎসর্গিতপ্রাণ করে রাখলেও গোষ্ঠীগত কোন অন্যায় বা কাপট্য-কে কোনদিন ক্ষমা করেননি, বরং প্রয়োজনে রেখে ঢেকে না বলে সরাসরি যুক্তিপ্রয়োগে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁর সমালোচনা কোথাও বিদ্রুপাত্মক বা কর্কশ হয়নি। 'টহল' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন (স, তো, ৮।৮/১৮৯৬),—'এতদ্দেশের প্রায় সকল পল্লীতেই কার্ত্তিক, মাঘ এবং বৈশাখ মাসে টহল দেওয়া প্রথা প্রচলিত আছে অর্থাৎ এক একজন বৈষ্ণব প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে করতাল বাজাইয়া প্রত্যেক গ্রামের লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রাচীন প্রথাটী অতি উৎকৃষ্ট কিন্তু কার্য্যটী বিশুদ্ধ রূপে করা হয় না। নাম দাতা বৈষ্ণব প্রতি গৃহস্থের ঘরে নাম দিয়া তণ্ডুল ভিক্ষা লইয়া থাকেন এবং মাস গত হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যেক বাড়ীতে কিছু কিছু চা'ল ও পয়সা আদায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য অন্য অনেক উপায় আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। হরিনাম

শুনিয়া গ্রামবাসীগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক যদি কিছু ভিক্ষা দেন, তাহা গ্রহণে ক্ষতি নাই, কিন্তু হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সা সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নাম দাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেম ফল লাভের সম্ভাবনা থাকেনা, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয় একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য। অতএব শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত। এ বিষয়ে সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বারংবার আলোচিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শুভফল দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার লিখিতেছি। যদি গ্রামস্থ শ্রদ্ধাবান বৈষ্ণব ভক্ত মহোদয়গণ আপন আপন অধিকারে হরিনাম দিয়া পয়সা গ্রহণ করার কু-প্রথা সংশোধন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা টহল লোকের ঘরে ঘরে প্রচার করাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে হরিনাম কীর্ত্তন ও শ্রবণের উদ্দেশ্য এবং জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)-এর সমকালীন রচনা (সামাজিক প্রবন্ধ—ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা—সামাজিক রীতি বিষয়ক/১৮৯২) থেকে একটু নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'ল,—'জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাসূত্র, এবং সমাজ নীতি যাহা যাহা বলেন, তাহার বিচার করিয়া এক্ষণে অপর তিনটি সামান্য কথার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ কথাগুলি আজিকালি বহুলোকের মুখেই শুনা যায়। (যেমন)—"খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিলে সমাজের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না।" কিন্তু আমার বিবেচনায় যখন সম্মিলনের প্রকৃত মূল বশ্যভাব, তখন খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক

সম্বন্ধের অবারিত ব্যবস্থা সম্মিলনের অনুকূল হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোন দেশেই ঐ সকল সম্বন্ধ অবারিত ভাবে চলে নাই, এখনও চলিতেছে না।'

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমালোচনার সুর কেদারনাথের কণ্ঠে সদাই দ্বিধাহীন ভাবে বেজেছে। যেমন (স, তো, ৫।১১/১৮৯৪),—'গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণব ভেদে,—ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম, উভয়বিধ বৈষ্ণবই দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা···অনেকপ্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থবৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেক কায়-ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণসেবা-পূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ।'

তুলনামূলকভাবে পরিণত বয়সেও সেকালের 'সাহিত্যসূর্য' মধুসূদন দত্তের সমকালীন রচনায় ও সাধারণ পত্রাদিতে গদ্যের ভাষায় সংস্কৃতবহুল প্রাচীনত্বের ছাপ সর্বাঙ্গে প্রকট ছিল। 'হেক্‌টর-বধ'-এর ভাষার একটু সাধারণ নমুনা এখানে দেওয়া গেল (হে, ব, ১ম প/১৮৭১),—'এ দুর্দ্ধর্ষ রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই।···আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক, বোধ হয় ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে।' মধুসূদন হেক্‌টর-বধের উপহারপত্রে ভূদেব মুখো-

পাধ্যায়কে লিখেছেন,—'এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেননা, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে।···যে শিলায় তুমি ভাই কীর্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার (হেক্টর-বধ কাব্যের) বিভারাশি···অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল যে, সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।'

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) সমকালীন রচনারও একটি সাধারণ নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'ল (ভ্রান্তিবিলাস, ১ম প/১৮৬৯)—'মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল ; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল ; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।'

অবশ্য মধুসূদনের সামাজিক নাটকে কথোপকথনের ভাষা আশ্চর্য-জনকভাবে অতি আধুনিক ছিল এবং সেখানে সমালোচনাও ছিল নির্মম ও ক্ষুরধার। যেমন ('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—দ্বিতীয়াঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক/১৮৬০), 'হানিফ গাজি—"কত্তাবাবু সালাম করি।" ভক্ত-প্রসাদ—"বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি· এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু একথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!"

হানিফ—"সে কি কত্তাবাবু ? আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ সেই নাড়্যে হতি বসিছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতে পারে ? তা একথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে"।'

প্রাসঙ্গিকভাবে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' —নব্যভারত/১৮৯১),—'যখন রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া··· ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম।···তাঁহার উদারতা, তাঁহার সহৃদয়তা তাঁহার দেশহিতৈষিতা ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। ···বাঙ্গালীমাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ধর্ম্ম বাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্ব্বনাশ বলিয়া···অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিতে লাগিল—গালি বর্ষণে পয়সা আসে। এ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে·· বলিলেন, "ভাই উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর।" পাঠকগণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন ?' [ধর্ম বেচিয়া পয়সা আদায় প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত কেদারনাথের 'টহল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]।

কেদারনাথ, মহাকবি ও ভক্তদের আলোচনায়, যে শ্রদ্ধালু সুললিত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আজও সমালোচনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয়।

তবে নিন্দনীয় ক্ষেত্রে শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে রেখেও কঠিনতম ভাষা প্রয়োগে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা পরম ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন (স, তো, ২।২/ ১৮৮৪),—'ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কেবল বৈষ্ণব জগতের রত্ন ন'ন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের একটী অলঙ্কারস্বরূপ। ইংরাজি ভাষায় চসার নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন।'

আবার কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী সম্বন্ধে কেদারনাথের অনবদ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি (স, তো, ২।১০-১১/১৮৮৫),—'শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ছিলেন।...তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন!...ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ।...তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ, "যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি—তোমার এই সিদ্ধবাক্যগুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথাকথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।'

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাপ্রকাশে নবীনচন্দ্র সেনের সমকালীন ভাষা ও ভাব তুলনামূলকভাবে লক্ষণীয় ('রঙ্গমতী' উৎসর্গপত্র/১৮৮০),—'কবিরত্ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে'—"দেখিতে দেখিতে বিংশতি (?) শতাব্দীর সূর্য্য সেই সময়-সাগরে ডুবিয়া গেল। তখন ফিরিয়া দেখিলাম বঙ্গের অসংখ্য জোনাকীরাশি একে একে নিবিয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি

নক্ষত্রমাত্র ইহার অদৃষ্ট আকাশে জ্বলিতেছে। তাহাদের কিরণ যতই সুদূর নিঃসৃত হইতেছে, ততই উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার একটিকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া আমি একটি সামান্য উপহার প্রদান করিলাম। বলিতে হইবে কি, সেই নক্ষত্রটি—আপনি? আমার সেই সামান্য উপহার—এই রঙ্গমতী?"

কেদারনাথের সুতীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার সমালোচনার একটি নমুনা থেকে বোঝা যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবাদে তিনি কতখানি অনমনীয় ছিলেন (জৈবধর্ম, ১০ম অ / ১৮৯৫),—'কলিকালে 'পণ্ডিত'-শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ে নিরর্থক ফাঁকি ও স্মৃতিশাস্ত্রের লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্ম-তাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মবঞ্চনায় ও জগৎ-বঞ্চনায় পটু, তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত! এই সকল পণ্ডিত-মণ্ডলীতে ঘট-পট লইয়া বিতর্ক হয়।'

অতিভক্তি কেদারনাথের দৃষ্টিকে কোনসময় অস্বচ্ছ করে তোলেনি, যেমন (স, তো, ৬।২/১৮৯৪),—'শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন।...তিনজনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী।...তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ

বোধ হয় না ;···তাঁহারা ব্রজরসজ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত পারঙ্গত ও গানবিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল।··মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন··· ব্রজবাসী থাকায় গৌরমণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর···ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির···ধর্মসংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন।'

এখানে শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব নির্দেশ করতে সুকৌশল শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। এঁরা যে প্রধানত সুদক্ষ কীর্তনীয়া ভক্ত সে কথাও স্তুতিচ্ছলে বলে দিয়েছেন।

দীর্ঘকাল সজ্জনতোষণী সম্পাদনাকালে প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেদারনাথ যেমন মানবিক বৃত্তির, সামাজিক রীতিনীতির, ধর্মীয় তত্ত্বের এবং প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বসূরী গ্রন্থকারদের চিন্তাশীল, তত্ত্বময় ও শ্রদ্ধালু সমালোচনা করেছেন, তেমনি তিনি মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট বঙ্গীয় রচয়িতাদের সুপরিচিত কিছু সংস্কৃত ও বাংলায় লেখা গ্রন্থেরও বিশ্লেষণমূলক অনবদ্য সমালোচনার নজীর রেখে গেছেন। সমকালীন কিছু তত্ত্বমূলক রচনা -সংকলন-অনুবাদ-টীকারও প্রয়োজনানুগ ভাষায় তাঁর ক্ষেত্রানুগ সমা-

লোচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমালোচনার মান নির্ণয়ের জন্য এখানে মধ্যে মধ্যে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকদের কিছু কিছু সমালোচনামূলক রচনাও উদ্ধৃত করা হ'ল।

গ্রন্থ-সমালোচনায় কেদারনাথ সাধারণত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবানুসারী। যেমন,—'দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ্-ব্রহ্মবাদিদিগের রচিত। বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই।···শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তিপোষকবাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ-স্বামীর ভাষ্যটী —সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্য -ভেদাভেদ-শিক্ষা-পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের-আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে···শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহপূর্বক তদনুযায়ী "রসিকরঞ্জন"-নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত একটী গীতাভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী— বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটী—বিচার ও প্রীতি-রস এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ···টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায়, · আপাততঃ (এটিই) প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিচার—সরল, এবং সংস্কৃত ভাষা—প্রাঞ্জল; সাধারণ পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—'রসিকরঞ্জন' বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা/১৮৮৬)।

অপরদিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'একখানি বাংলা টীকা' রচনাকালে

বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বলেছেন (১৮৮৬)—'বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে অনেক সময় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী।··শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন···নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতা-সন্দীপনী" নামক একখানি বাঙ্গালা টীকা-তে গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝাইয়াছেন।··আমিও যতদূর পারিয়াছি পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্কর-ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীকৃত রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ণ করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে,··যাঁহারা বিবেচনা করেন এদেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।'

কেদারনাথ কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের একখানি সাম্প্রতিক পদ্যানুবাদের সমালোচনা করেছেন। এখানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। রসোদ্রেকী ভাষার আধারটিও উপভোগ্য। তিনি লিখেছেন (স, তো, ৭।২/১৮৯১),—'সরল শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক শ্রীজয়দেবের অপ্রাকৃতভাব বজায় রাখা বড় কঠিন। এই গ্রন্থে সেই কার্য্য নির্দ্দোষরূপে করা হইয়াছে।···শ্রীজয়দেব একজন অপূর্ব্ব কবি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি একজন

অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিক ছিল ইহা সকলেই স্বীকার করেন।···তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসময় কাব্য বিশেষ। জগতে এরূপ আর কাব্যগ্রন্থ নাই। সাধারণ সমালোচকগণ প্রাকৃত রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। জয়দেব কবি সেই সকল সমালোচককে তাঁহার নিজগ্রন্থ সমালোচনের জন্য অর্পণ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ তাঁহাদের জয়দেব সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয় মাত্র। অনুবাদকদ্বয় কৃতবিদ্য ও রসজ্ঞ। তাঁহাদের কৃত অনুবাদ বৈষ্ণবদিগের কর্ণভূষণ হউক।'

জয়দেব ও তাঁর গীতগোবিন্দের সমালোচনা অনেকবার হয়েছে এবং ভবিষ্যকালে আরও অনেকবার হবে। কিন্তু কেদারনাথ গীতগোবিন্দের আন্তর রসের আলোচনায় যে নিরিখ রচনা করেছেন এবং অর্বাচীন সমা-লোচকদের অগভীর সমালোচনা সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী রেখে গেছেন, তা এ ধরণের গ্রন্থের সমালোচনার ক্ষেত্রে ভাবীকালের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকলেও সে পথ এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছিল। অথচ এরই অল্পকাল আগে সেকালের বিলাত ফেরত আইনজ্ঞ angry young man প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) কবি জয়দেবকে নস্যাৎ করে দিয়ে মন্তব্য করেন ('জয়দেব' ১৮৯০—প্রবন্ধ সংগ্রহ-১ম, ১৯৫২)—'জয়দেব অধিকাংশ কবি-দিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয়

দিয়াছেন ; প্রেমের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গাররসকে কবিতার বর্ণিত বিষয়রূপ স্থির করিয়াছেন।…জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাত একঘেয়ে। তাঁহার বিরহীবিরহিনীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভালো লাগিবার কথা তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহ ভাবের অন্যকোনো অংশ ধরিতে পারেন নাই।…আমরা দেখিতে পাই যে জয়দেবের উপমা-সকল প্রায়ই নেহাত পড়ে-পাওয়া গোছের।…জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু-আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন।… ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।'

এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সমালোচনার প্রকৃত অর্থ সম্যক আলোচনা, কেবলমাত্র নিন্দা নয়। তরুণ প্রমথ চৌধুরী বয়ঃতেজের আধিক্যে ও পাশ্চাত্য ভিক্টোরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আত্যন্তিক প্রভাবে কাব্যের আন্তর রসের সন্ধান পাননি, পাননি ধ্বনিরসের সঙ্গীতমূর্চ্ছনা ; ফলে বহি-রঙ্গের কটু স্বাদে তাঁর মুখ বিকৃত, মন ক্লিষ্ট হয়ে গেছে। না হলে, "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী। হরতিদর তিমিরমতি ঘোরম্ ॥"—এর মত সুললিত সঙ্গীত-ঝঙ্কৃত অলঙ্কার তাঁর দৃষ্টির নাগাল এড়ালো কি করে ; কবি-জয়দেব কোথা থেকে এমন অলঙ্কার চুরি করলেন! যদিও গীত-গোবিন্দে চিরাচরিত বহুজন-ব্যবহৃত অনেক অলঙ্কার অনেক ক্ষেত্রে পুন-রায় ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'একটু-আধটু বদলাইয়া' দেওয়ার ফলে এবং নতুন পদ ও ছন্দের সংবেশে সে সব অলঙ্কারই নূতনতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। অথচ অবস্থা এই যে, চৌধুরী মশায়ের এই অর্বাচীন সমালোচনা সাহিত্যের নজীর হয়ে অমর

হয়ে আছে সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তাদের হাতে, কারণ তিনি বড় ক্যাম্পের লোক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজগুণে খ্যাত হয়েছিলেন ; ওদিকে অনাবিষ্কৃত থাকায় কেদারনাথ এঁদের হাতে কল্কে পেলেন না।

প্রসঙ্গতঃ বর্তমান কালের দুজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রগাঢ় পণ্ডিত সমালোচক অজানিতভাবে কেদারনাথের বক্তব্যের অনেকটা প্রতিধ্বনি করেছেন। সুতরাং সমকালীন না হলেও সমালোচনার মান হিসাবে তাঁদের বক্তব্যের কিছুটা এখানে তুলে ধরা হ'ল। ডঃ সুশীলকুমার দে গৌণভাবে প্রমথ চৌধুরীর সমভাবী বক্তব্য দু একটি রাখলেও তাঁর কথা মুখ্যত ভিন্ন সুরের ('জয়দেব ও গীতগোবিন্দ'—নানা নিবন্ধ/১৯৫৪),—'শুধু ভাব বা কথাবস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। জয়দেব তাঁহার কাব্যে এমন কোন বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যে বর্ণিত হয় নাই।…কিন্তু জয়দেবের কাব্যের রূপরসটি তাঁহার নিজস্ব।…তিনি যে বিশিষ্ট আকার ও ভঙ্গিমা দিয়াছেন তাহাই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য।'

পরম পণ্ডিত, ভক্ত সমালোচক ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন ('কাব্যকথা'—কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, ১৯৫০),—'কবি কল্পনার প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকৃত শিল্পীর সংযম বা অর্থের পরস্পর সাপেক্ষ সার্থকথা, শব্দময় আলেখ্য লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি বৈচিত্র্য, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, পদলালিত্য, ও গীতি মাধুর্য্য তাঁহার কাব্যকে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে।…তাঁহার রচনায় অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত প্রীতির, কল্পনার সহিত অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে।'

তরুণ মহলের বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও অব্যাহতি পাননি। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর সমালোচনা করে চন্দ্রনাথ বসুকে যে পত্র দিয়েছিলেন (১৮৮৪—রবীন্দ্রজীবনী-১ম, পৃঃ ১৪৭/১৩৬৭) তার উত্তরে প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) লেখেন ('আনন্দমঠ'-১৮৮৪/ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৯৪৪)—'আমি এইরূপ বুঝি যে আনন্দমঠের পাত্রগণকে যদি আপনার কেবলমাত্র নাম ও নম্বর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে এক-ব্রতীরা যথার্থ ই এক-ব্রতী হইয়াছে—বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য যথার্থ ই সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা—এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট অথবা এক-ব্রতী লোকদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা তাহারা নিজে করেনা—কে যেন তাহাদিগকে সেই সব কার্য্য করায়। যে করায় সে হয় একটি idea, নয় একটি ব্যক্তি।...অতএব আপনার যে বোধ হইয়াছে যে আনন্দমঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন যাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে, ইহাই আমার মতে আনন্দমঠের success-এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সত্যানন্দ যথার্থই ভেল্কী।'

বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন হলেও কেদারনাথ তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণী ভঙ্গীর সঙ্গে কোন কোন সময় কিছুটা চাঁচা-ছোলা ভাষা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। যেমন পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্যপার্ষদ হরিদাস ঠাকুরের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত একখানি জীবনচরিত গ্রন্থের সমালোচনায় কেদারনাথ লিখছেন (স, তো, ৮।৩/১৮৯৬),—'অঘোরবাবু সর্ব্বত্র প্রমাণ দিয়া ঘটনা সকল বর্ণনা করিয়াছেন।...আজকাল অনেকেই নিজের ইচ্ছামত বিষয় প্রমাণ করিবার

জন্য কল্পিত প্রমাণ সৃষ্টি করেন।…(কিন্তু) আমরা দুঃখের সহিত মনে করিতেছি যে তিনি তর্কান্ধ হইয়া ভক্তির স্বভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। যাঁহারা ভক্তির স্বভাব অনুভব করেন নাই, তাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক জ্ঞানে পীড়িত, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই। যাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাঁহাদের শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্ত-দিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান শ্রবণের ন্যায় অভক্তের ভক্তচরিত্র অনুশীলন বিফল।…বড় দুঃখের সহিত আমাদের এত কথা বলিতে হইল।…অঘোরবাবু এত ভালকথা লিখিয়া এক কলস দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র সংযোগের ন্যায় জ্ঞানদগ্ধ মত-বাদ-রূপ একটি বাক্য দ্বারা এরূপ উপাদেয় গ্রন্থখানিকে মাটী করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় !! দ্বিতীয় সংস্করণের সময় গ্রন্থকর্ত্তা এই উপাদেয় গ্রন্থের মধ্যগত মতবাদরূপ মলটী দূর করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।'

অবশ্য বিরূপ সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও বাক্‌সংযম লক্ষ্যণীয়। তিনি সাধারণভাবে বাঙ্গালী লেখকদের সমালোচনা স্পর্শকাতরতা সম্বন্ধে লিখছেন ('হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'— রাজনারায়ণ বসু। বঙ্গদর্শন-১৮৮৩),—'দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীমধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগকে আমরা প্রশংসা করিনা। অপ্রশংসা দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্যজাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন ;…বাঙ্গালী অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইন না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা

দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়।…মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ত্রুটী হইয়াছে বিবেচনা করিয়া রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন।'

সবশেষে একটি গুরুভার সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনার প্রয়োজনে কেদারনাথ কি রকম গুরুগম্ভীর ভাব ও সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করেছেন তার একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি সকল রকম ভাষাই অবলীলায় ব্যবহার করতে পারতেন। একটী সম্পাদিত বেদান্তদর্শন গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি লিখলেন (স, তো, ৮।১/১৮৯৬),—'এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র সটীক গোবিন্দভাষ্য তথা…বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন…। এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং

পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত-গুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তিসচ্চিদানন্দপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষদোষ-বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন।...এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে এই সূত্র ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়। আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ।'

সকল প্রবন্ধ বা সমালোচনাই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না। আবার সাহিত্যরূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টাকৃত প্রবন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। মূল বিষয়বস্তু অটুটভাবে ব্যক্ত হয়েও যে প্রবন্ধ সুখপাঠ্য হয়, প্রকাশগুণে পাঠককে বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ কোনমতেই দুর্বোধ্য বা ক্লান্তিকর হয় না, সেই প্রবন্ধই সাহিত্য। কেদারনাথের ক্ষেত্রানুগ ভাষা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী, বক্তব্য বিষয়ে অটুট নিবেশ তাঁর প্রবন্ধগুলিকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। একথা অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে বঙ্কিম-রবীন্দ্র স্তরে কোন প্রাবন্ধিকই এ পর্যন্ত উঠতে পারেননি। তবে কেদারনাথ প্রাবন্ধিক হিসাবে সে যুগের অন্যান্য মধ্যম-স্তরের রচয়িতাদের সঙ্গে একাসন পাওয়ার নিশ্চয়ই উপযুক্ত ছিলেন।

এখানে এ যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যতাত্ত্বিক অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ-সাহিত্য ও প্রাবন্ধিক সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য তুলে ধরে এ পর্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাচ্ছে। শ্রীগুপ্ত বলেছেন (ভূমিকা—'প্রবন্ধ সংগ্রহ-১ম',-প্রমথ চৌধুরী/১৯৫২),—'বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা রচনার মধ্যে প্রবন্ধরচনায় হাত দিলেন তখন তাঁর সাহিত্যের সোনার কলমে প্রবন্ধের মধ্যে এল বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরি পাওনা, যাতে রচনা হয় সাহিত্য।

প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠল।...অনেক বিষয় আছে যাদের সম্বন্ধে চরম সাফল্য বক্তব্যকে সুব্যক্ত করা। রাঙিয়ে বলা কি সাজিয়ে বলা যেখানে হাস্যকর। অস্থানে কবিত্ব অর্থাৎ ঔচিত্য জ্ঞানের অভাব।.. অলঙ্করণ এখানে বোঝা চাপানো।..এখানে রচনার যে গুণের প্রয়োজন সে হচ্ছে শুধু প্রসাদগুণ। অবশ্য এ প্রসাদগুণ আয়ত্ব করা সহজসাধ্য নয়, সর্বজনসাধ্যও নয়।...রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।...এ রকম বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ।....রামেন্দ্রসুন্দরের... প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তাঁর গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা।...প্রমথ চৌধুরী... সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না।... প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি বিতর্কমূলক।'

—দশ—

ধর্মসাহিত্য (গদ্য)

ইতিপূর্বে কেদারনাথ দত্তের সুবিশাল গদ্য-সাহিত্যের দুটি অংশের—রম্যসাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য—কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তাঁর সমগ্র সাহিত্যের বৃহত্তম অংশ—বাংলা গদ্য-

সাহিত্যের অন্তর্গত ধর্ম-সাহিত্যের আলোচনায় আসা যাক। ধর্ম যেখানে নিছক তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত, গূঢ়ার্থের সূক্ষ্মতায় কণ্টকিত, চেষ্টাকৃত গুরুভাবে ভারাণ্বিত—সেখানে সেই লিখিত জ্ঞান-ভাব-তত্ত্বসার সাধারণের কাছে নীরস ও কেবলমাত্র নিদ্রাকর্ষণ সহায়ক। লোকসাধারণ স্বভাবতই এমন জিনিষ এড়িয়ে চলে। এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞ ধর্ম-শিক্ষকগণ ধর্মাদর্শ ও ধর্ম-তত্ত্বকে কাহিনীর মোড়কে সাধারণের কাছে সহনীয়, গ্রহণীয় এমন কি আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। এই ভাবেই উদ্ভব হয়েছিল নানা ধর্মভিত্তিক কল্পকাহিনীর ও পুরাণের। যেগুলো কাহিনীর সরসতায় ও কুশলী পরিবেশনার গুণে যুগ-যুগান্ত ধরে জনমনের আনন্দ-বেদনা রসে রঞ্জিত হয়ে লোকসাহিত্যে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ লোকে যেমন এসব কাহিনীর পাত্র-পাত্রীকে যুগ পরম্পরায় সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তেমনি অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে পুণ্যের ও পাপের ফলে তাদের সুখ ও দুঃখ ভোগকে। ফলে আপামর জনসাধারণের মনে বসে গেছে ধর্ম, ন্যায় ও নীতির সাধারণ বোধ। সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই এ ধরণের কল্প ও ইতিকথা ভিত্তিক পুরা-কাহিনীর প্রভাব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায়।

কেদারনাথ নীরস ধর্ম-ভিত্তিক তাত্ত্বিক রচনার এই দুর্বলতা যেমন জানতেন, তেমনিই কাহিনীর প্রতি সাধারণের আকর্ষণ সম্বন্ধেও ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সচেতন। কিন্তু ধর্মবিষয়ক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তাত্ত্বিক আলোচনাকে একেবারে এড়ানো সম্ভব হয় না। তাই তিনি শুষ্ক আলোচনা অংশকে ভেঙে ভেঙে পরিবেশন করেছেন, আর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়েছেন উপযুক্ত আকর্ষণীয় কাহিনী—কোথাও গাম্ভীর্য-

ময়, কোথাও করুণ, আবার কোথাও রঙ্গরসসিক্ত। তত্ত্ব ও কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, যেন একখানি অপূর্ব নক্সীকাঁথা—যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি প্রয়োজন মেটায়। তিনি নিজেই লঘুভাবে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লিখেছেন—'আজকাল লোকেরা উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন। উপন্যাসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; কেননা বিষয়ীদিগের চিত্তে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বকথা প্রবেশ করিতে করিতে চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে' (স, তো, ১৮৯৮, ১০।১২।১৪)।

তাঁর বহু ধর্মভিত্তিক রচনার মধ্যে আছে—কল্পকাহিনীময় কথপোকথন ভিত্তিক রচনা 'প্রেম প্রদীপ' ও 'জৈবধর্ম', সুপ্রচারিত তত্ত্ববহুল চরিতকাব্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য', তত্ত্বমূলক 'বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' ইত্যাদি (পূর্বে প্রদত্ত রচনাসম্ভার দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি রচনার বিষয়বস্তু জটিল হলেও প্রকাশ কুশলতায় ও ভাষা মধুর্যে সকল পাঠকের কাছেই বোধ্য ও আকর্ষণীয়। সেই কারণেই কেদারনাথের এই গোষ্ঠীর রচনাগুলিও সাহিত্য পদবাচ্য। তার মধ্যে আবার জৈবধর্ম ও অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য অতুলনীয়। কেদারনাথ সরল স্বল্প-শিক্ষিত পাঠককে যেন হাত ধরে এক বিশাল পারমার্থিক রত্ন-ঐশ্বর্যময় প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন, তাঁর চোখ দিয়ে দেখে, তাঁর মুখ থেকে শুনে সব যেন চেনা মনে হচ্ছে; সরল পাঠক পারবে না আর কারো কাছে এ তত্ত্বের পুনরোক্তি করতে, কিন্তু মন তার ভরে উঠেছে তৃপ্তির আনন্দে। আবার বোদ্ধা প্রাজ্ঞ পাঠক পাবে অকপট যুক্তি ও নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত; কিন্তু তা পাবে এক হৃদয় মজানো প্রীতির প্রলেপে,

যা বিতর্কের কোন সুযোগ রাখে না। ভাষার সারল্যের সঙ্গে প্রকাশ মনোহারিত্ব মনকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলে।

শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের ভক্তি, সারল্য ও দীনতাই যে প্রধান সম্পদ, এবং তা দার্ঢ্য, বহুজ্ঞাত অবৈষ্ণব আত্ম-প্রত্যয়ীকেও আকর্ষণ করে, কেদারনাথ তার উপপত্তি করলেন একটি মধুর কাহিনীর মাধ্যমে (জৈবধর্ম, ১ম অধ্যায়, ১৮৯২), 'একদা অপরাহ্নে···বাবাজী মহাশয় লতামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' পাঠ করিতে করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমন সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে সাষ্টাঙ্গপতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচ জ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া···ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।··· কহিলেন, "প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন, আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন?" সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহাকে বল্কলাসন দিয়া··· প্রেমগদ্‌গদ-বাক্যে কহিলেন,—"প্রভো! এ দীন ব্যক্তি আপনার কি সেবা করিবার জন্য যোগ্য?" কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন কহিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন।···প্রচুর অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্র তাৎপর্য্য বিতর্কে অনেক কাল যাপন করিয়া···প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি।···সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি।·একদিবস কোন সাধু বৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া

চলিয়া গেলেন।...আমি দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব দর্শনে ও তাঁহার মুখে নাম শ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল, তাহা আমি তৎপূর্ব্বে কখনই বোধ করিতে পারি নাই।...আমি কয়েকদিবস বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, বৈষ্ণব পদাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ।...আপনি এ দাসকে নিজ কৃপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন"।'

আবার আর একটি কল্প-চরিত্রে বিধি-ভক্তির ছলাকলার মাধ্যমে ভক্ত সাজতে সাজতে কেমন করে অজান্তে অন্তরে ভক্তিরসের অনুভূতির উদয় হ'ল তার রঙ্গরসসিক্ত বর্ণনা (জৈবধর্ম, ৩য় অধ্যায়, ১৮৯৩)—'সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটি ভাগ্যবান লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান রাজা-দিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটি গণ্যমাণ্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী এবং দলাদলি কার্য্যে বিশেষ পটু। বহুদিন, ঐ সকল পদ ভোগ করিয়া তাহাতে সুখ লাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে তিনি দিল্লীর কালোয়াতদিগের নিকট রাগরাগিনী শিক্ষা করেন।...যদিও বৈষ্ণবগণ তাঁর কালোয়াতি সুর ভালবাসিতেন না, তথাপি সংকীর্ত্তনে একটু একটু কালোয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার একটু নামে সুখবোধ হইল।...মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী।'

একটি রূপকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতে পরমার্থ-তত্ত্বের ঐতিহাসিক

পূর্ণতা প্রাপ্তির কি অনায়াস বর্ণনা! (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—উপক্রমণিকা, ১৮৮০),—'পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতী তীরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ড কাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড় দেশে কাবেরী স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎপবিত্রকারিণী জাহ্নবী তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্বতা পরিদৃষ্ট হয়।'

এবার এখানে তুলনামুলকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সমকালীন সমধর্মী রচনা থেকে কিছু গুরু-শিষ্য সংবাদ নেওয়া যাক (ধর্মতত্ত্ব, ৭ম অধ্যায়—সামঞ্জস্য ও সুখ)—

'শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম।...কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশীক নিয়মাধীন।...তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।'

বঙ্কিমচন্দ্র আবার অন্যত্র বলেছেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-২য় অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক ব্যাখ্যা)—'সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমারা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, একথারও বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার সান্ত চিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায়না।'

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে লিখেছেন (পত্রাবলী, ১৯৪১)—'এদেশে ভিতরে ভিতরে সত্য-ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছে, কিন্তু আবার অনেকে প্রচলিত ধর্ম্ম ছাড়িয়া, বিপরীত দিকে অনেকদূর যাইতেছেন। ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না ; পাপ, পরিত্রাণ, Grace—এ সকল কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু Pantheism-এর ভাব লক্ষিত হয়। একটি উপাসনা মন্দিরে প্রতি রবিবার এইভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইয়া থাকে। দেখিলে বড় কষ্ট হয়।···একটি বিশেষ শুভ চিহ্ন এই যে, প্রতি রবিবারে অনেকে আমার Sermon শুনিতে উপস্থিত হ'ন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থা'ক, দেখ তাঁর ইচ্ছাতে কি হয়।'

ইংলণ্ডের নটিংহাম যাজকদের পত্রের উত্তরে কেশবচন্দ্র লণ্ডন থেকে

১লা অগষ্ট ১৮৭০-এ লেখেন (পত্রাবলী)—'বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায় সকলের মতগুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগের নিশ্চয় করিয়া জানাইতে ভিক্ষা করিতেছি যে যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কল্যাণকর ভাব অন্তরস্থ করিতে আমি ব্যাকুল। আমি সে সকল নিজের ও নিজের দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) তাঁর আত্মজীবনীতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রাহ্মধর্মের মূল সূত্রটুকু তুলে ধরেছেন (আত্ম-জীবনী-১৮৯৮, ৪র্থ সং ১৯৬২, পৃঃ ১৩৬-৩৭)—'ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মনীতি কি, ইহা ব্রাহ্মদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক, এবং সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারে চরিত্র গঠন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই দুই অঙ্গ, একটি উপনিষদ, অন্যটি অনুশাসন। ব্রাহ্মধর্ম্মে'র প্রথম খণ্ডের উপনিষদ তো সমাপ্ত হইল; এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনু-শাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে শ্লোক-সকল সংগ্রহ করিয়া অনু-শাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম।'

কেদারনাথের প্রকাশ নৈপুণ্যের গুণে, কাহিনী পরিবেশের পাত্র-পাত্রীর আচরণ মাধ্যমে, পাঠকের মন অতি সহজেই ধর্মাদর্শহীন ধূর্ত

শঠের প্রতি বিরূপ ও ধর্মাশ্রয়ী সৎ-চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে; ফলে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠকও নিজের অজ্ঞাতে সদ্ধর্মের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে যায়। কেদারনাথ একটি ধূর্ত কু-চরিত্র অঙ্কন কৌশলে পাঠককে ধর্মাদর্শহীনতার প্রতি সার্থকভাবে বিরূপ করে তুলেছেন (জৈবধর্ম, ১৭শ অধ্যায়, ১৮৯৪),—'ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ব্রজনাথকে রাত্রে সব কথা বলিলেন; ব্রজনাথ সে সব কথার উত্তর না দিয়া আহারাদির পর শয়নপূর্বক শুদ্ধজীবের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে একটু অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। সে সময়ে ব্রজনাথের মাসতুতো ভ্রাতা বাণীমাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথের পিতামহী···বলিলেন,—"ভাই তুই কাজের লোক, ব্রজনাথকে বুঝাইয়া সুজাইয়া বিবাহটা দে।" বাণীমাধব একটু খর্বাকৃতি, ঘাড় ছোট, রং কাল, চোখ মিটমিটে; সকল কথায় থাকে, আবার কোন কথায় থাকে না। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিল,—"কুছ পরোয়া নাই, তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কি না করিতে পারি? আমার কর্ম্ম ত জানো? ঢেউ গুণেও পয়সা আদায় করি।"···দিদিমা বলিলেন—"ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে, পড়েছে।" তাহা শুনিয়া বাণীমাধব—"কল্য প্রাতে আসি' কার্য্য করিব"—এই বলিয়া প্রস্থান করিল। অতি প্রত্যুষে সে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছেন।···ধূর্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধব কহিল—"আমি তোমার সমস্ত কার্য্যের সহায়;···তুমি এখন সন্ন্যাস করিবে, আমি তোমার দণ্ড-করঙ্গ বহিব।" ধূর্ত লোকের দুইটি জিহ্বা,

একজনের কাছে একরকম বলে এবং অন্যের নিকট অন্যরকম (বলে) বলিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে, তাহাদের হৃদয়ের কথা সহজে পাওয়া যায় না ; মুখটী মধুমাখা, হৃদয়টি বিষে ভরা।'*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা আলোচনাকালে প্রখ্যাত সাহিত্য ইতিহাসবেত্তা ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৭১, পৃঃ ৪৩৮-৩৯)—"তাঁকে আমরা ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা ও সংগঠকরূপে দেখেছি বলে বাংলা গদ্যসাহিত্যে ও গদ্যরীতিতে তাঁর দান আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।...তবে তাঁর অধিকাংশ রচনা ব্রাহ্মধর্ম-ঘেঁষা...বলে উক্ত সম্প্রদায়ের বাইরে পুস্তিকাগুলির বিশেষ প্রচার হয়নি—এই জন্য অনেকে তাঁর গদ্যরীতির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন।' এ মন্তব্য অনায়াসে অসিতবাবু কেদারনাথ সম্বন্ধেও করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কেদারনাথ দত্ত বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম বা রচনার কথা আদৌ শোনেননি বলেই মনে হয়। উপরন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ্য

---

*কেদারনাথ জৈবধর্মের প্রকাশ আরম্ভ করেন সজ্জনতোষণীর সঙ্গিনী (সংযোজন বা পরিশিষ্ট) হিসাবে ৪র্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যা (১৮৯২) থেকে এবং ৯ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায় (মার্চ ১৮৯৮) সমাপ্তিপর্ব (৪০শৎ অধ্যায়) প্রকাশ করেন। কিন্তু মনে হয় তার একবছর আগেই তাঁর রচনা সমাপ্ত হয়েছিল (মাঘী পূর্ণিমা, ৪১০ চৈতন্যাব্দ ॥ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭), কারণ গ্রন্থশেষে তিনি লিখছেন—

"গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি। ভকতি বিনোদ দীন বহু যত্ন করি ॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয় ভাষায়। সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায় ॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে। গোদ্রুমে স্বরভিকুঞ্জে জাহ্নবী সমীপে ॥"

হওয়ায় বিশেষ ভাবেই আলোচিত হয়েছে। কেদারনাথের কোন রচনা কো'নদিন কি পাঠ্য হবে ?

অসিতবাবু একই গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন (পৃঃ ৫৮৩-৮৪)— 'কেশবচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ ধর্মজগতের অধিবাসী হলেও বাংলা গদ্যে অসামান্য অধিকার অর্জন করেছিলেন। এঁরা সাহিত্য করবার জন্য কখনও কলম ধরেননি, অলস অবকাশে রসসৃষ্টির বিলাসিতা এঁদের কর্মযোগী চরিত্রে আদৌ খাপ খেত না।···সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান ইচ্ছা না থাকলেও এঁদের স্বভাবের মধ্যেই সাহিত্যের বীজ ছিল।' এ মন্তব্য ত হুবহু কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধেও খাটে। তবে তাঁর সম্বন্ধে এ নীরবতা কেন ?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' সর্ববাদী-সম্মত ভাবে বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থ। এটি সর্বাধিক প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থও বটে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ থেকে বহু সংস্কৃত শ্লোক সমন্বিত হওয়ায় এবং অনেক স্থলে বৈষ্ণব তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যাদি থাকায় বিজ্ঞ বৈষ্ণব ভক্তের সহায়তা ভিন্ন এ গ্রন্থের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা সাধারণ পাঠকের সাধ্য নয়। কেদারনাথ দত্তের পূর্বে ও পরে অনেকেই এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা-টীকা লিখেছেন বটে, তবে তাঁদের সবিদগ্ধ ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠককে যত না মূল গ্রন্থের মর্মার্থ গ্রহণে সাহায্য করেছে, তার চেয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সুবিপুল কলেবর ও মূলের অধিক জটিলতা পাঠককে অভিভূত ও বিহ্বল করেছে। এইখানেই কেদারনাথের সার্থকতা। তাঁর সরল নির্ভরযোগ্য, নিরবচ্ছিন্ন, নাতিদীর্ঘ টীকা সাধারণ পাঠকের কাছে সত্যই অমৃতপ্রবাহ, তাঁর

'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে সর্বসাধারণের বোধায়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে। আগে এটি ছিল ভক্তি ও সম্ভ্রমের বস্তু, কিন্তু অনেকটা দুর্বোধ্য হওয়ায় থাকত একটা সভয় দূরত্ব। কেদারনাথ তাঁর অমৃতপ্রবাহ এনে সাধারণের রসপিপাসা দিলেন মিটিয়ে, দূরের বস্তু হ'ল কাছের, আর ভয় কেটে এল আনন্দ। কেদারনাথের ধর্মসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে জৈবধর্মের পরেই এই অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের স্থান।

প্রকাশ যে ১৮৮০-৮২ তে তিনি যখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটি সরল টীকা সমন্বিত সংস্করণ প্রস্তুতে হাত দিয়েছিলেন, তখন বহরমপুরের পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এই গ্রন্থের একটি সটীক সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে বার করছিলেন। তিনি কেদারনাথকে একাজে তখন হাত না দিতে অনুরোধ করে বলেন যে কেদারনাথের গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে তাঁর নিজের গ্রন্থ আর বিক্রয় হবে না। সহৃদয় কেদারনাথ তাই তখনকার মত একাজ বন্ধ রাখেন। তখন পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-১ম খণ্ড (মূল : আদি-মধ্য-অন্ত্য) ১২৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। পরে তিনি সজ্জনতোষণী পত্রিকার সঙ্গিনী (সংযোজন) হিসাবে ৩য় বর্ষ, ১১শ (১৮৯০) থেকে ৪র্থ বর্ষ ১০ম (১৮৯১) পর্যন্ত বারটী সংখ্যায় সমগ্র অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য (শ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃত॥ ২য় খণ্ড—ভাষ্য সম্পূর্ণ) ১২৫৭ থেকে ১৬৯৮ পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে গ্রন্থ শেষে ১০ পৃষ্ঠা রস-শব্দাবলী ছিল। দু খণ্ডে বাঁধাই হয়ে সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রথম প্রকাশিত হয় সজ্জনতোষণীর কার্যালয় ভক্তিভবন, ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে কার্যাধ্যক্ষ রাধিকা-

প্রসাদ দত্তের প্রকাশনায় ৪০৯ শ্রীগৌরাব্দে (১৮৯৫)। বর্তমানে এই প্রথম সংস্করণ গ্রন্থটি অত্যন্ত দুঃপ্রাপ্য। যদিও বিভিন্ন গৌড়ীয়মঠ থেকে কেদারনাথের (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অনুভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এ সব সংস্করণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেদার-নাথের প্রবোধন (ভূমিকা) থাকে না। ভবিষ্যতে এটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখা যাচ্ছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রবোধন।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই গ্রন্থের তুল্য বঙ্গভাষায় ভক্তিপূর্ণ ও তত্ত্বপূর্ণ আর একখানিও পুস্তক নাই। এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থের সবিস্তর একখানি ভাষা-ভাষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে, তাহার টীকা ও অনুবাদ পূর্ব্ব মহাজনগণ করিয়াছেন। বিদ্বৎবর মদ্‌বন্ধু শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থ সটীক সানুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বৈষ্ণবজনবন্ধু শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তর অনুবাদ করিয়াছেন। অম্বিকা-কালনার কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ মিলিত হইয়া এই গ্রন্থের একপ্রকার ভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন। মদীয় সতীর্থ শ্রীযুত পণ্ডিত মাখনলাল দাস মহাশয়ও এই গ্রন্থের কিয়দংশ ব্যাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমুদয় অনুবাদ ও ভাষ্যাদি পাঠ করিয়াও বিদ্বদ্‌ভক্তমণ্ডলী আমাকে গ্রন্থের

আর একটী ভাষ্য রচনা করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় আমি বৈষ্ণব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ এই ভাষাভাষ্য রচনা করিলাম।

গ্রন্থ মধ্যস্থ সংস্কৃত শ্লোকগুলির সংস্কৃত টীকা দিয়া এই ভাষ্যটীকে অনাবশ্যক রূপে বৃহৎ করিতে ইচ্ছা করিলাম না। সরল বঙ্গানুবাদ পাইলেই পাঠকদিগের শ্লোকার্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। যাঁহারা কেবল শ্লোকগুলির টীকার সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সন্দর্ভাদি টীকা পাঠ করিতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রত্যেক পদ্যের অর্থ করিতে গেলে অনর্থক গ্রন্থ বৃদ্ধি হয়। এতন্নিবন্ধন কেবল দুর্ব্বোধ্য পদ্যগুলিরই (যতদূর সরল হইতে পারে) ব্যাখ্যা করা হইল। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি রসিকাভিমানীগণ যে সকল পদ্যের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ দ্বারা বিকৃত অর্থ প্রকাশ করেন সেই সকল পদ্যে যে যে স্থলে সুব্যাখ্যার প্রয়োজন তাহা করিয়া দিলাম। বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের ও শ্রীপাদগোস্বামী প্রদর্শিত রসতন্ত্রের সহিত যে যে স্থলে সম্বন্ধ আছে তাহা স্বল্পাক্ষরে দেখান হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণের পক্ষে সেই সেই শাস্ত্রের রীতিমত শিক্ষা না থাকিলে যতই সরলভাবে লেখা থাকুক না কেন, সহজে বোধগম্য হয় না। এই ভাষ্যের শেষ ভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাবলীর অর্থ করিয়া দেওয়া গেল।

পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুনয় এই যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব গ্রন্থকে সামান্য কাব্য ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিবেন না। বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন সহকারে সদ্‌গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয় সেইরূপ

এই মহাগ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। আজকাল অনেকেই না পড়িয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, কেহ বা সেইরূপ পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা বিনা অনুসন্ধানে স্বীকার করতঃ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থ অনুশীলন করিতে গেলে নিরপেক্ষ ভাবে সেই সকল দোষ পরিত্যাগ করিতে হয়। এই গ্রন্থে বেদান্ত ও রসশাস্ত্রমূলক শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ মত-দূষিত ও সহজিয়া -বাউলগণ প্রচারিত বিকৃত ধর্ম্মের সহিত এই গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। এই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ও স্মরণ রাখিয়া মহোদয়গণ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

এবার বিভিন্ন সুখ্যাত ভাষ্যকারের রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষ্যের কিছু নমুনা নেওয়া যাক। প্রথমে মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদের ১২৭ সংখ্যক পয়ারটি (কো'ন সংস্করণে ১০০) দেখা যাক, যথা—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

কেদারনাথ এর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য করলেন,—

'...কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু ('গুরু') হইবার অধিকার বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্ত আছে যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা— বিপ্রই হউনা বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু (কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই 'গুরু') হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত

নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণব-পর (লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর ;)। অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত (-) বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগাভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে (কোন) বর্ণে বা যে (কোন) আশ্রমে (ই) পাওয়া যায় (যা'ন), তাঁহাকে গুরু ('গুরু') বলিয়া অর্চনা (বরণ) করেন (করাই বিধি)।' এখানে কেদারনাথের প্রথম সংস্করণের বক্তব্যের মধ্যে মধ্যে বন্ধনী অন্তরে সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত প্রচলিত সংস্করণের পাঠ দেওয়া হ'ল। আদি সংস্করণে ১৪৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় এই পয়ার মূলের ৪২৫ পৃষ্ঠার ১৯-২০ পং (পংক্তি না পদ ?) হিসাবে উল্লিখিত আছে।

কেদারনাথ পুত্র বিমলাপ্রসাদ (দত্ত) সিদ্ধান্ত সরস্বতী (পরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী) তাঁর দীক্ষা নাম বার্ষভানবী দয়িতদাস নামে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্পূর্ণ টীকা 'অনুভাষ্য' ১৯১৫ সালে সমাপ্ত করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্করণে উপরোক্ত পয়ারের দীর্ঘ ভাষ্যের মধ্যে লিখেছেন,—'বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্ম-প্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে,—বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না।···বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার বৃত্তব্রাহ্মণতাই

স্বাভাবিক ; সুতরাং কলি প্রচলিত শৌক্র সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না, তৎস্থলে কৃষ্ণবিৎ হইলে শৌক্র শূদ্রও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন।'

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর সুবিশাল টীকা-সমন্বিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে একই পয়ারের অতি বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে লিখলেন, (মধ্যলীলা, ৩য় সং, ১৯৫০, পয়ার ১০০, পৃঃ ৩০৪)—'বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন। এস্থলে "গুরু"-শব্দ দ্বারা "শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু" দুইই বুঝায়।...যাঁহারা জাত্যাদির অভিমানশূন্য শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ তাঁহারা ..যিনিই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ রসিকভক্ত, তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিতে পারেন ; তিনি শূদ্রই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন না।'

তিনটি ব্যাখ্যাতেই বক্তব্য মোটামুটিভাবে এক। কিন্তু কেদার-নাথের ব্যাখ্যার সারল্য, স্পষ্টতা ও সীমিত কলেবর সাধারণ পাঠককেও অতি সহজেই মূলের উপলব্ধি করায়, অথচ পাণ্ডিত্যের বিস্তারের মধ্যে বিহ্বল করেনা। অন্য দুজনের সুবিস্তার ব্যাখ্যা সাধারণের জন্য নয়, বিদগ্ধ রসজ্ঞানীর জন্য। ডঃ নাথের ব্যাখ্যায় আপাত সারল্য থাকলেও, অপরিমিত বিস্তার সাধারণের পক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর। এই জন্যই পরের দুজনের ব্যাখ্যা—জ্ঞানী প্রয়োজনে ও ছাত্র পাঠ্য বাধ্যবাধকতায় ব্যবহার করে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের জন্য মাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলো। এ আলো চোখ ধাঁধিয়ে মূলকে আবছা করে দেয় না। পাঠক এই স্নিগ্ধ আলোয়

পড়ার আনন্দে আলোকে যায় ভুলে, মূলের রসে মজে যায়। তাই অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য সাহিত্য, কেবলমাত্র জ্ঞানের বর্ষণ নয়। কেদারনাথ অযথা সকল পদের ব্যাখ্যা-বিস্তার করেননি। মূলে কবিরাজ গোস্বামী নিজেই উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের ভাব-বিস্তার পরের বাংলা পয়ারে করেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও তত্ত্বের জটিলতার জন্য বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করার জন্য বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সুবোধ্য নয়—এখানেই বিশেষ করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কেদারনাথ তাই ভূমিকাতেই বলে দিয়েছেন যে, কেন তিনি সংস্কৃতাংশ সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করে বা সকল পয়ারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অযথা কলেবর বৃদ্ধি করেননি। মূল গ্রন্থের বহুল সুবোধ্য প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ফলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থটি কলেবরে ও মূল্যে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে ছিল, অথচ ভাষ্যটি ছিল সুখপাঠ্য ও নির্ভরযোগ্য।

এই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটি পরে আর ছাপা হয়নি। ১৯১৫র পর থেকে অনেক বৃহত্তর কলেবরে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর অনুভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের (কেদারনাথের) অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য নিয়ে মূল গ্রন্থ প্রথমে মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ থেকে ও পরে অন্যান্য গৌড়ীয় মঠ থেকে ছাপা হয়ে আসছে। বর্তমান গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যমঠের একটি অজানিত অংশ থেকে কেদারনাথেব এই অমূল্য অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-২য় খণ্ড) ১ম সংস্করণের যে কপিটি আবিষ্কার করেছেন সেটি আর একদিক থেকেও একটি অমূল্য দলিল (record)। কারণ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ১৯১৫-তে তাঁর অনুভাষ্য সম্পূর্ণ করার পর অমৃত-প্রবাহ সমেত নতুন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করার পূর্বে পিতৃদেবের ভাষ্যটি

এই কপিটিতে স্বহস্তে বহুস্থানে সংস্কার করেছিলেন (অনেক ক্ষেত্রে সাদা কাগজে অতিরিক্ত পৃষ্ঠাও সংযোজন করেছেন)। সুতরাং মূলের পরিপূর্ণ চেহারা (অবশ্য বহু মুদ্রণ প্রমাদ বাদ দিয়ে) ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর স্বহস্ত সংস্কার—এই কপিটি হারালে আর পাওয়া যাবে না, অথচ কপিটি বর্তমান গ্রন্থকার ফেরত দিতে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। শ্রীচৈতন্য-মঠে নানা সময়ে শিষ্য-বিরোধে অনেক ওলটপালট হয়েছে ও বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অজানিত অংশে থাকার জন্য এই কপিটি ও সজ্জনতোষণীর একটি পর্পরভর্জিত বাঁধন খোলা খণ্ড (৪র্থ থেকে ১২শ বর্ষ,—কিছু পত্রহীন) খোয়া যায়নি। এমতাবস্থায় বর্তমানে উপযুক্ত পরিচালকদের কাছে বিনীত আবেদন যে, তাঁরা যেন এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য সমেত মূল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এখন সহজলভ্য বহুল প্রচারিত গ্রন্থ, অতএব আর উদাহরণ তুলে অযথা এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা হ'ল না।*

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাব গম্ভীর দিকটি কেদারনাথ দত্তের হাতে

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ১ম সংস্করণে রচনা শেষের ও প্রকাশ তারিখের কিছু অসংগতি আছে। পরিচিতি পত্রপৃষ্ঠে প্রকাশকাল আছে শ্রীগৌড়ক্রমচন্দ্রাব্দাঃ ৪০৯। কিন্তু গ্রন্থশেষে লেখক লিখেছেন,—

'গৌর চারিশত দশে, মেষ শুক্ল একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ বনান্তরে।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য, ইহাতে পূরিল দাস্য,
দোষক্ষমা মাগি অতঃপরে ॥

অনেকখানি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে বঙ্গভাষায় অজানিত, সংস্কৃতে রচিত, তত্ত্ববহুল বহু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের সুষম অনুবাদে। এ ধরণের অনুবাদ পূর্বেও বেশ কিছু হয়েছিল, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূলের চেয়ে অনেক বেশী কলেবরে অতি পাণ্ডিত্য প্রকাশী সভাষ্য অনুবাদে পাঠককুল ভীত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। সে তুলনায় কেদারনাথের বিষয়ানুগ কিন্তু আকর্ষণীয় ভাষা, নিয়ে এসেছে মূলকে পাঠকের অনেক কাছে। অনুবাদক এখানে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের বিশালত্বে মূলকে আচ্ছন্ন করেননি। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমন মধ্বাচার্যের 'শ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী' বা 'মায়াবাদ শত-দূষণী'র কেদারনাথ-কৃত অনুবাদ (১৮৯৪) থেকে কিছুটা নিয়ে দেখা যাক—

মূল—জীবাত্মনোরৈক্যমতং বিহায়
ভেদস্তয়োঃ স্থাপয়তি স্বযুক্ত্যা।
শ্রুতিং স্মৃতিং তত্র বহুপ্রমাণং
কৃত্বানুমানং বহুধা তনোতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—'সেই পৌরাণিক (মধ্বাচার্য), বেদান্ত ভাষ্যকার অন্যাচার্য্যের স্বকপোলকল্পিত জীবব্রহ্মের অভেদ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় যুক্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্থাপন করিতেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যকে প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করতঃ অনেক প্রকারে অনুমান বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩ ॥'

পুনরায় মূল—

সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদ বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে
তদন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিদ্বেষৈর্পয়িত্বা মতিং।

শ্রীশ্রী শিক্ষাষ্টক।

[গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড, ৪৭-৪৮ সংখ্যা]

১

পীত বরণ কলি পাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব বিভোরা ॥ ১
চিত্ত দর্পণ পরি মার্জ্জন কারী।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় চিত্ত বিহারী ॥ ২
হেলা ভবদাব নির্ব্বাপণ বৃত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ক্লেশ নিবৃত্তি ॥ ৩
শ্রেয় কুমুদ বিধু জ্যোৎস্না প্রকাশ।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ভক্তি বিলাস ॥ ৪
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবন রূপ।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় সিদ্ধ স্বরূপ ॥ ৫
আনন্দ পয়োনিধি বর্দ্ধন কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্লাবন মূর্ত্তি ॥ ৬
পদ পদ পীযূষ স্বাদ প্রদাতা।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেম বিধাতা ॥ ৭
ভক্তি বিনোদ স্বাত্ম স্নপন বিধান।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেম নিদান ॥ ৮

কেদারনাথ দত্তের হস্তাক্ষর
(১৮৮৬)

তৎশব্দোঽব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং ত্বত্র ভেত্তোয়তঃ।

ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব ন হি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ॥ ৬॥

অনুবাদ—'মায়াবাদী ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে তত্ত্বমসিরূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। তৎ শব্দে তিনি, ত্বং শব্দে তুমি, অসি শব্দে হও, এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্তসম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ নিরূপণার্থে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তৎ শব্দ অব্যয়, তস্য শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। তস্য তং অসি এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। তস্য শব্দে ভেদ প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে॥ ৬॥'

উপরোক্ত তুটি উদাহরণের প্রথমটিতে কেবলমাত্র সরাসরি ভাষান্তর করা হয়েছে: কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ভাষান্তরের মাধ্যমে ভাবেরও কিছুটা বিস্তার করেছেন; তবে উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার সারল্যের জন্য ভাব গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।

পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কৃত যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদের অনুবাদ ও তাৎপর্য সমন্বিত একটি গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করেছেন কেদারনাথ তাঁর নিজের 'বেদার্কদীধিতি' (বেদ সূর্যের কিরণ) অনুবাদ ও ভাবার্থ যোগ করে (১৮৯৪)। একই শ্লোকের সিদ্ধান্তানুবাদ (তাৎপর্য সহ) ও বেদার্কদীধিতি (ভাবার্থ সহ) পর পর রেখে একটু তুলনা করা যাক—

মূল—অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তানুবাদ—'যাহারা আত্মঘাতী তাহারা মৃত্যুর পর প্রগাঢ় তিমিরাবৃত অসুর লোকেই গমন করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥' তাৎপর্য্য—'এই মানবজীবন মোক্ষোপযোগী। যিনি ঈদৃশ জীবন প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করেন না,…তিনিই আত্মঘাতী।…তিনি মৃত্যুর পর ভোগলুব্ধ স্বার্থপর লোকসকলের নিবাসভূত গাঢ়ান্ধকারাবৃত নরকে গমন করেন। পক্ষান্তরে নিষ্কাম ভগবৎপরায়ণ সাধুপুরুষসকল উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভে কৃতার্থ হইয়া আত্মানন্দে ভাসিতে থাকেন। এরূপ লোকের ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না।…এইরূপ হইলে, মুক্তি স্বয়ং তাঁহার সেবা করিবে। নতুবা তৎকৃত সকাম কর্ম্মের ফলে তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবে ॥ ৩ ॥'

বেদার্কদীধিতি—'যাহারা পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরী ভাবপ্রাপ্ত লোক সকলের প্রাপ্তব্য যাহা (অন্ধকারে আবৃত) তাহাই…হয় ॥ ৩ ॥' ভাবার্থ—'যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে না, বিরাগ লভোদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মানুশীলনের জন্য বিরাগকে আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম বিরাগ স্বার্থপর অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কারক হয়, আত্মানুশীলনের সহকারী নয়। অতএব তাহাদের জীবন মরণ-প্রায়।…যে জীবের এরূপ আচরণ, তাহার আত্মা জড়ে বিনষ্টপ্রায় হইতে থাকে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে আত্মঘাতী

বলা যায়। সেই···ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আসুরী ভাবকে লাভ করে; আত্মার স্বাভাবিক দৈবভাবকে ত্যাগ করে। অতএব সর্ব্বতোভাবে সংসারে পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর চেষ্টারূপ কর্ম্ম আচরণ কর। নামমাত্র কর্ম্ম থাকিবে। স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎ পরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে ॥ ৩ ॥'

এখানে যখন সিদ্ধান্ত বাচস্পতি আক্ষরিক অর্থে ভাষ্য করেছেন এবং আত্মঘাতী মৃত্যুতে নরকবাস, পুনর্জ্জন্মের কথা ও মোক্ষলাভের বাধার কথা বলেছেন; কেদারনাথ সেখানে সমস্তটাই ভাবার্থে নিয়েছেন, অর্থাৎ জীবনেই মরণপ্রায় অবস্থা লাভ আত্মঘাতের সমান, ফলে আসুরা ভাব আসে,—সেখানে মৃত্যু, পুনর্জন্ম, মোক্ষলাভের কথা নেই, আছে পরমাত্ম-সম্বন্ধ লাভের প্রয়াসের কথা।

কেদারনাথের পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যতগুলি সটীক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রায় সবকটিই অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জটিল হওয়ায় সাধারণের আয়ত্বের বাইরে থেকে গিয়েছিল। তাই কেদারনাথ তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'সারার্থবর্ষিনী' টীকা সমন্বিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সাধারণের বোধগম্য 'রসিকরঞ্জন' মর্মানুবাদ করতে বসে 'অবতরণীকা'য় বাস্তবানুগ ভাষায় লিখলেন (১৮৮৬)—'নিগম-শাস্ত্র' অত্যন্ত বিপুল। তাহার কোন অংশে 'ধর্ম্ম', কোন অংশে 'সাংখ্যজ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য—এরূপ ক্রমাধিকার তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্পায়ুবিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণমেধা-যুক্ত···জীবগণের

পক্ষে উক্ত বিপুল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্ব্বক অধিকার-ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—নিতান্ত আবশ্যক।···ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কর্ম্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্যজ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ ব্রহ্ম-বাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্য মত'—বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ভারতভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলীগত অচর্ব্বিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল। উক্ত উৎপাত কলির আগমনের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ পরম কারুণিক ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ সর্ব্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসারূপ শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন; সুতরাং গীতাশাস্ত্র—সমস্ত উপনিষদের শিরোভূষণ-স্বরূপে দেদীপ্যমান।···

'গীতাশাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে,—এক ভাগের নাম 'স্থূলদর্শী' এবং অপর ভাগের নাম 'সূক্ষ্মদর্শী'। স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই সিদ্ধান্ত করে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে···বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না; তাঁহারা 'ব্রহ্মজ্ঞান' নতুবা 'পরাভক্তি'কে গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন।···

'রসিকরঞ্জন সাধ্যমত সরল ভাষায় লিখিত হইল। যে-সমস্ত

দুরূহ শব্দ অপরিহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইল সে সকল শব্দের অর্থ টীকাতেই আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদকগণ অনুবাদ মধ্যেই ঐ সকল শব্দের অর্থ ও সংস্কৃত টীকা-কারের শব্দ প্রয়োগ চাতুরী প্রকাশ করিতে গিয়া অনুবাদগুলি দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি।'

গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১-৭২ শ্লোকে আছে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

কেদারনাথ তাঁর 'রসিকরঞ্জন'-এ এর মর্মানুবাদ করলেন,—'কাম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥ ৭১ ॥ এই প্রকার স্থিতিকেই 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলে। হে পার্থ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। অন্তকালে খট্টাঙ্গ রাজার (মৃতদেহের) ন্যায় ঐ স্থিতি লাভ করিলেও তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলে। ব্রহ্মপ্রাপক জড়-মুক্তিকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে। জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম 'ব্রহ্ম'; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত রস লাভ হয় ॥ ৭২ ॥'

বঙ্কিমচন্দ্র কেদারনাথের রচনার অব্যবহিত পরেই (১৮৮৬) তাঁর সটীক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপরোক্ত শ্লোক দুটির ভাষ্য কিন্তু একটু অন্যভাবে করলেন, যেমন—'যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া

বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মমতাশূন্য=আত্মাভিমানশূন্য ॥ ৭১ ॥ হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালে ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭২ ॥ তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং কামনা পরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিত চিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথেষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠা।

'ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতি নির্বাচন মাত্র। হিন্দু ধর্ম্মে বা অপর কোন ধর্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যাগায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের—

লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

রসিকরঞ্জন মর্ম্মানুবাদে কেদারনাথ এখানে ভক্তিযোগ নিয়ে এসে ভাব বিস্তার করলেন, যেমন—'ভগবান কহিলেন,—আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্য-যোগ ও কর্ম্ম-যোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়। ভক্তিযোগ ব্যতীত মোক্ষ-সাধনোপায় আর কিছুই নয়। সেই ভক্তিযোগ (বা) সাধন বিষয়ে নিষ্ঠা—দুই প্রকার, যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়, তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান যোগেই নিষ্ঠা (বর্ত্তমান)। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্যযোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তিযোগে অধিরূঢ় হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই তাহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক অবশেষে ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভ করে। বস্তুতঃ ভক্তিভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র। আরোহীদিগের অবস্থা-ক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয় ॥ ৩ ॥'

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু পূর্বকথা টেনে এনে এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত বাস্তবানুগ ভাষ্য করলেন,—'কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই…যে, কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায় (২য় অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক)। হে অনঘ ! ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম) যোগীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি ॥ ৩ ॥'

রসিকরঞ্জন ভাষ্য রচনার কিছুদিন পরে কেদারনাথ যখন আবার বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যসমেত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রকাশ করলেন (১৮৯১) তখন তিনি তার সঙ্গেও তাঁর নিজের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষ্য যোগ করে দিলেন। এই ভাষ্যও সরল ও সাধারণ পাঠকের উপযুক্ত করে রচিত এবং বহুলাংশে পূর্ববর্তী রসিকরঞ্জন মর্মানুবাদের অনুরূপ। তবে পরে রচিত হওয়ায় বিদ্বদ্রঞ্জনে পূর্ববর্তী ভাষ্যের সংস্কার মাধ্যমে কিছু কিছু রদবদল করেছিলেন।

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কের ক্ষেত্রে কেদারনাথের মসি-লেখ অসি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণধার। কিন্তু শ্রদ্ধেয়ের সমালোচনায় কি অপূর্ব শালীনতাবোধ! বিনয় ও সুদৃঢ় প্রতিবাদের কি বিস্ময়কর সম্মিলন! অমিত শক্তিশালী ভাষা, অনবদ্য সরস বাকভঙ্গী! এ মণিকাঞ্চনের নিদর্শন পাওয়া গেল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার ('আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত') সজ্জনতোষণী পত্রিকায় কেদারনাথ-কৃত একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধে (স, তো, ১৯০০, ১১।১০।১৪-২৩)। পুস্তিকাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং সমালোচনার জন্য বাল্যবন্ধু সজ্জনতোষণী সম্পাদক কেদারনাথের হাতে দেন। এই দুজনের হৃদ্যতার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাঠক পূর্বেই পেয়েছেন। কেদারনাথ লিখছেন—

'বাল্যকাল হইতে তিনি আমাদের বড়দাদা।…আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের পদত্রাণ বাহক। তন্নিবন্ধন আমরা যে কোন প্রতিবাদ করি তাহা বড়দাদা অবশ্য সদয় হইয়া বিচার করিবেন।… বড়দাদা ঐতিহাসিক নৈপুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কবিত্ব শক্তির দ্বারা নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবার

যত্ন পাইয়াছেন। বড়দাদার বাঙ্গালা লেখা আমাদের ভাল লাগে। তিনি চিরদিন কৌতুকময় পরিহাসে পটু। ইতিহাস বর্ণনেও সেই পরিচয়টা সর্ব্বত্র দিয়াছেন।...আমরা বড়দাদার বক্তৃতা যত পাঠ করি ততই তাঁহার কবি-কল্পনা শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই। ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার নিকট সুদূরবর্ত্তী বিষয়।...পড়িতে পড়িতে ৮০ পত্রে আমরা দেখিলাম যে বড়দাদার কবিত্বের ফল ফলিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ ভক্তি একপ্রকার মস্তকবিহীন হৃৎপিণ্ড।

'বড়দাদা যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়াছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নই। যেখানে মতবাদ সেই খানেই বিচিত্র কথার উদয় হয়।...আমাদের কথা এই বৈষ্ণব শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। জিজ্ঞাসা অবস্থায় যাহা জ্ঞান তাহাই আস্বাদন অবস্থায় ভক্তি। বৈষ্ণব গ্রন্থের সর্বত্র শুদ্ধ জ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতে এই তিনটি কথা—সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয় সাধন ও প্রয়োজন।...তিনিই সদ্‌গুরু যিনি এই সম্বন্ধ জ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন।

'বড়দাদা! তুমি জ্ঞান হইতে ভক্তিকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পার? তুমি বৈষ্ণব শাস্ত্র না দেখিয়াই একটি কুসংস্কার জনিত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি হয়ত কোন ভাক্ত বৈষ্ণবের সহিত দুই একটা

কথা কহিয়া তিতুমীরের গোলা খা ডালা-র* ন্যায় বৈষ্ণব তত্ত্ব বুঝিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছ। তোমার ন্যায় বীরপুরুষ যে এরূপ অবিচারিত বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন তাহা আমরা জানিতাম না।·· একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে মানুষ কি পাজি, মনুষ্যমাত্রকেই পাজি বলা যায় না, কেবল চোরকেই পাজি বলা যায়।

'বড়দাদা! আবার ১০২ পত্রে কি লিখিয়াছ? "বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমেরই সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেমের অতীব উচ্চ মর্য্যাদা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু জ্ঞানের অভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম উন্মত্ততায় এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে, আর উদ্যমশীলতার অভাবে প্রেম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।" বিষয়গুলির যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে কুসংস্কার হৃদয়ে প্রবেশ করে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শিক্ষা দ্বারা এবং আচার দ্বারা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা জানিয়া শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ করিবেন না। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" এই লক্ষণ ভক্তি যাঁহাদের সাধন দশায় দেখা যায়, তাঁহারা অবিলম্বে পরিপক্কাবস্থা লাভ করতঃ প্রেমকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রেমে কি কেবল উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিতে পারে? ··

---

* লর্ড বেন্টিকের সময় অমুসলমান বিদ্বেষী ২৪-পরগণার অত্যাচারী মুসলমান লাঠিয়াল তিতুমীর ইংরাজ কামানের গোলা কি জিনিষ বুঝতে না পেরে গর্বভরে বলেছিল—'গোলা খা ডালা', কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেই গোলার ঘায়েই মৃত্যু হয়েছিল।

'বড়দাদা ! তুমি কোন অর্ব্বাচীন ভাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে (ভেক-ধারী সহজিয়া) লক্ষ্য করিয়া এ সব কথা লিখিয়াছ। ইহাতে বোধ হয়, তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ কর নাই।···

'বড়দাদা ! বিনয়পূর্ব্বক বলি যে পূর্ব্ব-সংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিকে আশ্রয় কর।···অলমতি বিস্তরেণ।'

কেদারনাথ দত্তের বিশাল গদ্যরচনা সমষ্টির অধিকাংশ যেমন ধর্মভিত্তিক, তেমনি এই রচনার একটি সুবৃহৎ অংশ এ পর্যন্ত সজ্জনতোষণী পত্রিকার বাইরে আর পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়নি। আংশিকভাবে বিভিন্ন সঙ্কলনে বা অন্যের প্রবন্ধে কিছু কিছু উদ্ধৃত হয়ে থাকলেও এবং সামান্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ প্রাচীন গৌড়ীয় পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়ে থাকলেও সজ্জনতোষণী পত্রিকা অন্তর্গত এই বিরাট প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পদ আর অল্প কালের মধ্যে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। প্রথমত সজ্জনতোষণী পত্রিকার সংখ্যাগুলোর বয়স এখন কমবেশী একশ বছর, তাছাড়া পাতাগুলোর পর্পরভর্জিত অবস্থা। মাত্র কয়েকটি সংখ্যার কিছু খণ্ডিত জরাজীর্ণ কপি সামান্য কয়েকস্থানে এখনও পাওয়া যাচ্ছে, তাও বর্তমান লেখকের সন্ধানের তাগিদে সেগুলো এখন বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করে ঝেড়েঝুড়ে রাখা হচ্ছে। এ সব রচনার মধ্যে কি বিরাট সম্পদই না রয়ে গেছে—এখানে আছে সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব আচার্যবর্গের তত্ত্বজীবনী (নিম্বাদিত্যাচার্য, শ্রীনিবাসাচার্য, যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য ইত্যাদি), বিভিন্ন বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নির্দেশিকা, বহু অনবদ্য তত্ত্বগ্রন্থ ও রচয়িতার সমালোচনা, ধর্মধ্বজী ও ভেকধারীদের যুক্তিনিষ্ঠ -রসসিক্ত-অম্লকষায় বিশ্লেষণ, বিভিন্ন স্থানমাহাত্ম্য এবং আরও অনেক

বিষয়ে বিচিত্র আলোচনা। বর্তমান পর্যায় গৌড়ীয় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও শাখামঠসহ শ্রীচৈতন্যমঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজই প্রধানত বর্তমান লেখকের অনাবিষ্কৃত কেদারনাথকে আবিষ্কার প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা ও শাখামঠসহ শ্রীচৈতন্যমঠের সভাপতি শ্রীল ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজও একান্তভাবে এই প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে সজ্জনতোষণীর সাল-খণ্ড-সংখ্যা-পৃষ্ঠা উল্লেখ করে সেখান থেকে কেদারনাথের সেরা প্রবন্ধগুলো হয় ১৫০তম জন্মবর্ষ অন্ত্যে একটি পুস্তকাকারে, না হয় একে একে বর্তমান পর্যায় গৌড়ীয়তে সংখ্যায় সংখ্যায় অবিলম্বে যেন পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে এ পর্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি আবার নব-জীবন পেয়ে এ যুগের পাঠকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে এবং ভাবী-যুগের গবেষকদের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হবে।

কেদারনাথের ধর্মভিত্তিক গদ্য-সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের আলোচনায় সজ্জনতোষণী পত্রিকার বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। তিনি সজ্জনতোষণী পত্রিকায় লেখার আদর্শ একেবারে সরাসরি স্পষ্টভাষায় 'নিবেদন' করেছেন (স. তো. ১৮৯৮, ১০।৫।১-৪),—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রতিজ্ঞা এই যে, কোন সময়েই পরমার্থ-তত্ত্ব ব্যতীত আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিবেন না। এই জগতে জড় বিষয় লইয়া অন্যান্য পত্রিকা সকল সর্ব্বদা আলোচনা করেন, কিন্তু সজ্জনতোষণী হরিকথা, হরিতত্ত্ব, আত্মসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করেন না। সুতরাং হরিভক্তিই এই পত্রিকায় জীবন।...যে

সকল সম্বাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখবিধান করেন, তাঁহারা জড় বিষয়ে প্রতিদিন নূতন কথা বলিতে পারেন। হরিকথা সেরূপ নয়। হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। ··এই সংসার খোসগল্পময়।.... আর এক কথা এই, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের নিজ রচনা বা নবীন প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন—আমরা পূর্ব্ব মহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি,—এই ভ্রমটি দূর হয়। মহৎলোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না।.... হে পাঠকবর্গ প্রতিদিন (ঐ সকল) গ্রন্থের রসাস্বাদন করুন।'

এই প্রতিষ্ঠাকামী জগতে কেদারনাথ আবার উল্টোকথা বলে বসলেন। যেখানে সকলে ছাপা অক্ষরে নিজের নাম নানা বিশেষণে ভূষিত হয়ে সবার ওপরে দেখতে না পেলে কুপিত হন সেখানে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টভাষায় প্রতিষ্ঠাশা বর্জন করতে বললেন ('প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন'—স, তো, ১৮৯৬, ৮।৩।৬৫-৬৮),—'আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি···যতই বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করি বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদকে খর্ব্ব করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে।···যদি কেহ বলে যে আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততা মাত্র তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। কেননা আমার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না। আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে

পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয় : কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়। কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, (বা) আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎ-পত্তি হয় তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠা আশা হইতে উদিত হয়।....কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে করি যে শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন। হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না।'

কেদারনাথ 'বৈষ্ণব গৃহস্থের আতিথ্য' সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতূহল-জনক সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন (স, তো, ১৮৯৭, ৮।১২।৩৫৩-৫৫),—'আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে দেশে আতিথ্য নাই, সে দেশ মরু-ভূমি তুল্য পরিত্যজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাহার আতিথ্য নাই লোকে প্রাতঃকালে তাহার নাম করে না।··· যে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের গৃহ-ত্যাগে অধিকার জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত গৃহস্থ থাকিয়া সর্ব্বদা অতিথি সেবা করিবেন।··অতিথি কে? উত্তর এই যে যিনি ক্ষুধিত হইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হন তিনিই অতিথি। স্বগ্রামবাসীকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করা বিধেয় নয়।·· গৃহস্থ কে? যিনি বিধিমত বিবাহিত হইয়া গ্রামে বাস করেন তিনিই গৃহস্থ। গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীই গৃহ।'

'অত্যাহার' সম্পর্কেও কেদারনাথ সুচিন্তিত ও সহানুভূতিশীল নির্দেশ দিয়েছেন (স, তো, ১৮৯৯, ১০।৯।১-৫),—অনেকে মনে করিতে পারেন যে অত্যাহার শব্দে অধিক ভোজন মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। (কিন্তু শ্রীমদ রূপ গোস্বামীর মতে) তাহা নয়।··· অত্যাহার শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে দ্বিরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে।··· ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগকেই বুঝায়। এরূপ প্রাকৃত বিষয় ভোগ, দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয় ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং বিষয় ত্যাগ, এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।··· বিষয়, ভোগ বলিয়া গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। অত্যাহার ত্যাগের বিধান একটি ভক্তি সাধনের নিত্য নিয়ম।··· গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্র করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষালাভ করিবেন তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়।'

কেদারনাথ কয়েকজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব আচার্যের তত্ত্বজীবন নানা কাহিনী সহযোগে এমন সরসভাবে পরিবেশন করেছেন যে সেগুলো একদিকে যেমন সাধারণের পক্ষে সুখপাঠ্য, অপরদিকে তেমনি তাঁদের সাধন-সত্য অত্যন্ত সহজভাবে ফুটে উঠে পাঠককে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত করে। কেদারনাথ প্রথমে শ্রীচৈতন্যপূর্ব চার বৈষ্ণব আচার্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ('শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য'—স, তো, ১৮৯৫, ৭।৭।২০৬-১৬),—'শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য এই চারিজন বৈষ্ণব আচার্য্য। আর যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন না কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ বিশিষ্টা-

দ্বৈতবাদী। মধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদী। বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। নিম্বাদিত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।' কেদারনাথ অতি সংক্ষেপে নিম্বাদিত্যের জীবন ও শিক্ষা এখানে প্রকাশ করেছেন,—'নিম্বাদিত্য একজন পুরাতন আচার্য্য। অনেকে বলেন যে ব্রজমণ্ডলের শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সন্নিধানে ইঁহার স্থান ছিল। ইনি সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণের মত প্রচার করিয়াছেন।··· নিম্বাদিত্যকে শাস্ত্রে অরুণি ও নিম্বার্ক নামে নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি কোন সময় নিম্ববৃক্ষের উপর চড়িয়া অর্করূপে উদয় হওয়ায় ঋষিগণ ইঁহাকে নিম্বার্ক বলেন। ইনি দশটি শ্লোকে নিজের শিক্ষা সংগ্রহ করিয়া জগতকে প্রদান করিয়াছেন।···নিম্বাদিত্যের মত ও গৌড়মতে (উপরোক্ত) অন্যান্য তিনটি বৈষ্ণব মত অপেক্ষা অধিকতর ঐক্য আছে।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সজ্জনতোষণীর পুরোনো সংখ্যাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ৮ম বর্ষের শেষ সংখ্যার (১২শ) ৩৭২-৮০ পৃষ্ঠায় কেদারনাথ-পুত্র তেইশ বছর বয়স্ক তরুণ বিমলাপ্রসাদের একটি সতেজ সমালোচনা প্রবন্ধ পাওয়া গেল। বিমলাপ্রসাদ ইতিমধ্যেই সংস্কৃত ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত করে 'সিদ্ধান্ত-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন (পরবর্তী কালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হন)। এ সময় তাঁর লেখার ভাষা ও ভঙ্গী আশ্চর্যজনক ভাবে কেদারনাথের অনুরূপ ছিল, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় একটা সংস্কৃতবহুল তৎসমপ্রধান নিজস্ব ধারা এসে যায়। সজ্জনতোষণীর প্রথম দ্বাদশ খণ্ডের মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁর এই লেখাটি ছাড়া আরও দুটি প্রবন্ধ (সংস্কৃত ভক্তমাল ৮।১২।

৩৫৮-৬৩, নামাশ্রয়ের ফল-১১।৫।৩০-৩২) স্বনামেই (২য়টিতে শ্রীবি) প্রকাশিত হয়েছে (যদিও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত' নামের একটি লেখাকে ও নামহীন কয়েকটি লেখাকে শ্রীল প্রভুপাদের লেখা বলে প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বিনা প্রমাণে দাবী করেছিলেন—'শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী': ভূমিকা, ১৯৩৮, কলিকাতা)। এখানে প্রাসঙ্গিক সমকালীন রচনা হিসাবে তাঁর এই সমালোচনা প্রবন্ধের ('নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি') কিছুটা তুলে ধরা হ'ল (১৮৯৭),—

'বেদান্ত মত কি ? কেবল অদ্বৈতবাদ না আর কিছু ? একথাটি এখনও আমাদের ব্রহ্ম ভ্রাতাগণ যত্ন করিয়া বুঝেন নাই।....শঙ্করাচার্য্যই বেদান্তের পুরাতন আচার্য্য। তিনি বেদান্ত সূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদ দেখিতে পান। রামানুজাচার্য্য পরে ঐ সূত্র সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতার্থ লক্ষ্য করেন। মধ্বাচার্য্য সেইসকল সূত্রেই আবার কেবলদ্বৈতবাদ দেখাইয়া দেন। নিম্বার্ক মহাশয় সেই সূত্র হইতেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেই সমস্ত বাদের সামঞ্জস্যরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সেই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া জগতকে দেখাইয়াছেন। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের অস্ফুট বিকার মাত্র। এই সকল বাদ লইয়া বিতর্ক করিতে গেলে মানবের ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত হইবে অথচ কোন সিদ্ধান্ত হইবে না।···এই কথাটি আমাদের নব্য (ব্রাহ্ম) ভ্রাতাগণ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা। অন্ধকারে হাঁতড়ানতে কোন ফল নাই।'

কেদারনাথ জীবনীসাহিত্য রচনায় সরল ও আলঙ্কারিক ভাষার মিশ্র ব্যঞ্জনায়, কাহিনীর কাঠামোয় তত্ত্বকে যে বিস্ময়কর চমৎকারিত্বে

পরিবেশন করেছেন তার তুলনা এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। সজ্জনতোষণীতে সম্পাদক হিসাবে তাঁর কোন রচনাতেই লেখক পরিচয় নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী যখন ১৯১৫ সাল থেকে নতুন সম্পাদক হিসাবে সজ্জনতোষণী ২য়-পর্যায়ের প্রকাশ শুরু করেন তখন তিনিও সেখানে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের লেখক পরিচয় না দিয়ে লিখতে থাকেন। পূর্ব-পর্যায়ে তাঁর লেখা স্বনামে বা দীক্ষা নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ের এই ধারাকে নিরিখ ধরে নিয়ে সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পর কোন সংকলক (সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ) পূর্বপর্যায়ের সম্পাদক কেদারনাথের কিছু লেখাকে সরস্বতী ঠাকুরের বেনামী লেখা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। সজ্জনতোষণীতে কেদারনাথের অনবদ্য চরিতসাহিত্য থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেল ('শ্রীযামুনাচার্য্য'—স, তো, ১৮৯৮, ১০।৫।৪-১২)—'রামানুজ কথিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কলিকালে অন্য তিনটি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে জগতে বিকাশ লাভ করে। শ্রীশঠকোপ যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম তদীয় শিষ্য মধুরকবিকে দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপরাঙ্কুশের নিকট হইতে শ্রীমন্ নাথমুনি প্রাপ্ত হন। শ্রীনাথের প্রিয়শিষ্য পুণ্ডরীক, শ্রীনাথ কথিত শঠকোপ মত তদীয় শিষ্য রামমিশ্রের নিকট রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হন। রামমিশ্র যামুনা-চার্য্যকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। যামুনাচার্য্যের নিকট হইতে গোষ্ঠীপূর্ণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। গোষ্ঠীপূর্ণের শিষ্য রামানুজ। রামানুজের পর হইতে সম্প্রদায় প্রণালী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

'চোলরাজ পুরোহিত আক্কিয়ায্যাতি, যামুনের অধ্যাপক মহাভাষ্য

ভট্টের নিকট বার্ষিক কর প্রাপ্তির লোভে দূত প্রেরণ করিলেন। দরিদ্র মহাভাষ্য কর-প্রদানে অপারক জ্ঞাপন করিলেন। যামুন....রাজ-পুরোহিতের ঈদৃশ ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইয়া দূতগণকে ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন।··· আক্কিয়াযাতি (দূতমুখে) দ্বাদশবর্ষীয় অর্ভক কর্ত্তৃক এইভাবে সম্ভাষিত হইয়া (ক্রোধে) জ্ঞানহারা হইলেন। চোলরাজ পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যামুনকে (পুরোহিতের সহিত তত্ত্ব-বিচারের জন্য) আনাইতে পাঠাইলেন।·· যামুন ও পুরোহিতের মধ্যে (পাণ্ডিত্য) বিচারে কে জয়লাভ করিবেন এই বিষয়ে (অন্তঃপুরে) চোলরাজ ও তদীয় পত্নীর সহিত আলাপ হইতেছিল। রাজা পুরোহিতের নিশ্চয় জয় হইবে ইহা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। রাজ্ঞী রাজবাক্যের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইলেন।....রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পুরোহিত পরাজিত হইলে তিনি অর্দ্ধরাজ্য হারাইবেন, রাজপত্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন যামুন পরাজিত হইলে তিনি ছয়মাসকাল দাসীত্ব স্বীকার করিবেন।···যামুনাচার্য্য বিজেতা হইয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

'পিতামাতার আগ্রহে শ্রীযামুনাচার্য্য দার-পরিগ্রহ করিয়া বীর-নারায়ণপুরে বাস করিতে লাগিলেন।.... যথাকালে (তিনি) দুইটি পুত্র লাভ করেন।··· (স, তো, ১০।৭।১৮-২০)—যামুনাচার্য্য রাজভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (গুরু) রামমিশ্র দেখিলেন তাঁহার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির (হস্তি,অশ্ব,শূরাদি পরিবেষ্টিত) যামুনের সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে গূঢ়নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।....কিছুদিনের মধ্যে, যামুনরাজের পাচকের সহিত রামমিশ্র সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন ও যামুনরাজের পরম প্রেষ্ঠ অলর্ক শাক (শ্বেত আকন্দ) সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া

যাইতেন।.... এই প্রকারে ছয়মাসকাল অতীত হইল। রামমিশ্র মনে করিলেন ছয়মাসকাল নিয়মিত শাক ভোজন করিয়াও যখন যামুন রাম-মিশ্রের সন্দেশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তখন তাহার অভাব হইলে শাক সংগ্রহকারীর অনুসন্ধান হওয়ারই সম্ভাবনা। এই স্থির করিয়া দিবস চতুষ্টয়ের জন্য (শাক প্রদানে) বিরত হইলেন।··· যামুনাচার্য্যের, প্রাত্যহিক আহার্য্যের বিপর্য্যয় সন্দর্শনে, কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। পাচক বলিলেন,—কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহই শাক দিয়াছেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব। বিশেষ বুদ্ধিমান পণ্ডিত। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তিনি কেবল আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।.... যামুনরাজ কহিলেন,—আগামী কল্য বৃদ্ধ আসিলে আমার সমক্ষে তাহাকে লইয়া আসিও।··· (স, তো, ১০।৯।৫-১২)—রামমিশ্র (আসিয়া) কয়েক-দিনের মধ্যে যামুনের নিকট সমগ্র গীতা ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের উন্নতি করিতে সমর্থ হইলেন।··· যামু-নাচার্য্য অতুলৈশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক রামমিশ্রের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।'

কেদারনাথের এই সুদীর্ঘ ধারাবাহিক কাহিনী-তত্ত্বময় যামুনচরিত আর অধিক বিস্তার করা এখানে সম্ভব নয়। তবে অনুরূপ দীর্ঘ ধারা-বাহিক রসঘন পরিবেশনে কেদারনাথ রচিত যামুনাদর্শ পরিগ্রাহী শ্রীরামা-নুজাচার্যের তত্ত্বজীবন থেকে অল্প কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে (শ্রীরামানুজাচার্য্য—স, তো, ১৯০০, ১২।৩।৩-১২),— 'অষ্টসাহস্র গ্রামে (শ্রীরামানুজাচার্য্য) সশিষ্যে উপনীত হইলেন। ঐ গ্রামে আচার্য্যের দরিদ্র বরদাচার্য্য ও ধনী যজ্ঞেশ নামক দুইটি শিষ্য বাস

করিতেন। রামানুজ (সঙ্গের) দুইটি শিষ্যকে ধনবান যজ্ঞেশের গৃহে নিজ আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইলেন। যজ্ঞেশ··· শ্রীগুরুদেবের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হওয়ায় শিষ্যদ্বয়ের যথোচিত শুশ্রূষা করিতে বিস্মৃত হইলেন। রামানুজ ধনী যজ্ঞেশের বিষয় জানিয়া সশিষ্যে দরিদ্র বরদাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেইকালে বরদাচার্য্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন।·· বরদপত্নী গুরুর শুভাগমন জানিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিধেয় বসন তৎকালে এতদূর জীর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে তৎপরিধান করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিতে অসমর্থা হন। ··বরদপত্নী অগত্যা হস্ততালি দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ গুরুদেব পাণিধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে স্বীয় মস্তকাবরণ বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। গুরু প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বরদপত্নী যতীন্দ্রকে প্রণামাদি সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে সক্ষমা হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—"গুরুসন্তর্পণের জন্য অর্থ, প্রাণ সমস্তই প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহে এমন কি এক ধান্যপ্রস্থও নাই, যদ্দ্বারা এ হতভাগিনীর গৃহে গুরুসেবা হইতে পারে। যে কোন পাপবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গুরুর আরাধনা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"···এই গ্রামেই যে দুর্ব্বিবেকী বৈশ্য (তাঁহার) সৌন্দর্য্যলোভে বিমূঢ় হইয়াছিল তাহার নিকট গেলে অবশ্যই অদ্যকার গুরু শুশ্রূষণোপযোগী দ্রব্যাদি লাভ হইতে পারে বিবেচনা করতঃ সাধ্বী বরদপত্নী অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন।.... বৈশ্য, (চিরাভীপ্সিত আশাবর্ত্ম উন্মুক্তপ্রায় দেখিয়া) আনন্দভরে প্রার্থিত দ্রব্যাদি তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। দ্রব্যসমূহ রামানুজের সম্মুখে রক্ষিত হইলে তিনি ঐগুলি গ্রহণ করতঃ শিষ্যগণের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভগবৎ

সেবান্তে পরিতৃপ্ত হইয়া পরিকরে প্রসাদসমূহ লাভ করিলেন।

'যথাকালে বরদাচার্য্য গৃহে আসিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন এবং পত্নীর সুবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বরদাচার্য্য···আচার্য্যের চরণামৃত এবং কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট লইয়া বৈশ্যভবনে সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। রামানুজের চরণোদক ও উচ্ছিষ্ট লাভ করিয়া (বৈশ্যের) অনাদি প্রচণ্ড দুর্ব্বাসনা তিরোহিত হইয়া বিবেক উদিত হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই বরদপত্নী পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—"মাতঃ দুষ্প্রজ্ঞোদ্ভূত কর্ম্মের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"···উভয়ে বৈশ্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামানুজের নিকট উপস্থিত করিলেন। শ্রীরামানুজ (সকল শুনিয়া) তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।'

স্থানাভাবে কেদারনাথের সুবিশাল অথচ আকর্ষণীয় পারমার্থিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা এখানেই শেষ করা গেল। এর পর তাঁর সুললিত কাব্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা যাচ্ছে।

—এগারো—

সংস্কৃত সাহিত্য

কেদারনাথ দত্তের সংস্কৃত ভাষায় রচনার পরিমাণও বিশাল। পূর্ণাঙ্গ মৌলিক রচনা তিনটি কাব্যাকারে গ্রথিত, যদিও সকল ক্ষেত্রেই গদ্যে ভাষ্য দেওয়া আছে। প্রথম কাব্যটি হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'

(১৮৮০), দ্বিতীয়টি 'শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্' (১৮৯৫), আর তৃতীয়টি 'শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্' (১৮৯৬)। এ ছাড়া বহু গ্রন্থের অনুবাদে, ভাষ্যে, টীকায় ও সূত্রধারায়, গদ্যে এবং পদ্যে, তাঁর বিশাল সংস্কৃত রচনাবলী ছড়িয়ে আছে। অবশ্য এ সমস্ত রচনাই যে সাহিত্য পদবাচ্য তা নয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সাবলীল প্রকাশ, ভাষার সারল্য— রচনার বিষয়বস্তুকে সহজেই কাছে এনে দেয়। ভাষা প্রকাশের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দেখে মনে হয় সংস্কৃত যেন তাঁর মাতৃভাষা, অথচ বাংলা ভাষায় অপরিচিত এমন শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত কম হওয়ায় সাধারণভাবে সংস্কৃত না জানা পাঠকও পড়ার সময় একটা পরিচিতির আস্বাদ পায়।

শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতা উপনিষৎ বা 'ঈশোপনিষৎ' গ্রন্থটি বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য এবং শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃত ভাষ্যরহস্যবিবৃতি ও বিস্তৃত সিদ্ধান্তানুবাদসহ, কেদারনাথ তাঁর সজ্জনতোষণী পত্রিকার সঙ্গিনী (সংযোজনী) হিসাবে ৩য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যায় (১৮৮৭-৮৯) ধারাবাহিকভাবে পুনঃপ্রকাশ করেন ; কিন্তু তিনি তার সঙ্গে তাঁর নিজের সংস্কৃতে ও বাংলায় পূর্ণাঙ্গ 'বেদার্কদীধিতি' (বেদসূর্যের আলোক) ভাষ্যও যোগ করেন। যেমন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥ ১॥

কেদারনাথ এ শ্লোকে বেদার্কদীধিতি ভাষ্য করলেন,—'জগত্যাং বিশ্বে যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) ; বিশ্বে যৎকিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ঈশাবাস্য (ঈশেন আবৃতম্)। তেন হেতুনা ত্যক্তেন (ত্যাগেন) জগৎ ভূঞ্জীথাঃ (ভোগং কুর্ব্বীথাঃ)। কস্যচিদ্ধনং (কস্যচিৎ ধনং) মা গৃধঃ (ন

আকাঙ্ক্ষীঃ) ॥ ১ ॥'—'এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগ ধর্ম্ম সহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১ ॥'

এর পরেও প্রতি শ্লোকের ক্ষেত্রে 'ভাবার্থ' দ্বারা আরও ভাব বিস্তার করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরের সংস্কৃত ভাষ্যে বন্ধনীর বন্ধনগুলো বর্তমান লেখকের। মূল প্রথম সংস্করণে (১৮৯৪ ?) এই বন্ধনীগুলো নেই এবং কেদারনাথের জীবদ্দশায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আর কো'ন সংস্করণ হয় নি। বন্ধনহীন অবস্থায় লেখায় দ্বিত্ব দোষ আসে, কারণ বন্ধনী-পূর্ব শব্দটির অর্থই পরের বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ প্রকাশকের অনবধানে প্রথম সংস্করণে এই মুদ্রণ প্রমাদটি থেকে গেছে। পরবর্তী প্রকাশকরা কোন পরিবর্তন করতে সাহস করেন নি (যদিও তাঁরা অন্যত্র অনেক পরিবর্তন করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই কেদারনাথের মূল মুখবন্ধটুকুও বাদ দিয়ে দিয়েছেন)। কেদারনাথ মূল শ্লোকের জটিল শব্দগুলোর এভাবে অর্থ করে দেওয়ায় তাঁর সংস্কৃত ভাষ্যও সাধারণের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে।

ঈশোপনিষদের শেষ শ্লোকের (১৮শ) ব্যাখ্যার অন্তে কেদারনাথ তাঁর ভক্তিবিনোদ ভণিতায় দীন ভাবে বলছেন—

বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ
গৌরাঙ্গ ভক্তপদ ভক্তিবিনোদকেন।
শ্রীগোদ্রুমে দ্বিজপতেশ্চরণ প্রসাদাৎ
প্রজ্জ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জ বনান্তরালে ॥

এই সরল সঙ্গীতময় শ্লোকটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

তাঁর সম্পাদিত ও সঙ্কলিত 'শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা' বা ভাগবত সূর্যের কিরণমালা (১৯০১) গ্রন্থের উপসংহারে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের ভণিতায় সুললিত ভাষায় লিখলেন—

শ্রীমদগৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপন-তৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতীমালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা ॥
নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন লভ্যতে সত্যঃ রাধামাধবয়োঃ ॥
দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সুযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥

আবার তিনিই এর ভাবার্থ করলেন—'উপসংহারে সংগ্রাহক বহু-মিনতিপূর্ব্বক কহিতেছেন, এই শ্রীগৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ গুম্ফিত (গ্রথিত) শ্রীমদ্ভাগবতী মাল্য উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সত্য শ্রীরাধামাধবের কৃপালাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গরূপে উদিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন, ইহাই সূচিত হইল।' অবশ্য একথাও এই ভাবার্থে যোগ করা যেত যে—তোমার স্বল্পদিন জীবনে বহু বিঘ্ন আছে, সুতরাং অতি যত্ন সহকারে ভাগবতের রস পান কর।

কেদারনাথ 'শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্' গ্রন্থে ১৩০টি সূত্র রচনা ক'রে বেদ-সংহিতার বাণী শ্রুতিপ্রমাণকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রতি সূত্রের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ পাদটীকায় দিলেও, প্রধানত তিনি বিভিন্ন সংহিতা, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে উদ্ধৃতি

দিয়ে সূত্র প্রমাণ করেছেন। অবশ্য এখানে রচনাশৈলী অপেক্ষা তত্ত্বগুণ প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র আম্নায়সূত্রম্ প্রথমে সজ্জনতোষণী পত্রিকার সঙ্গিনী (পরিশিষ্ট) হিসাবে ৪র্থ বর্ষে দুটি সংখ্যায় (১১শ ও ১২শ—১৮৯২) প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৮৯৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ গ্রন্থটিকে 'সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণং শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণং' বলেছেন এবং গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে রচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিবৃত করেছেন—

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্য্যবিগ্রহং।
কেন ভক্তিবিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ॥ (ক)
প্রমাণৈরষ্টভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ং।
অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ত্রিংশোত্তরশতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া।
পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ। ইতি॥ ১॥

যদিও তিনি এই সরল শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন, তার উল্লেখের এখানে কো'ন প্রয়োজন নেই। অবশ্য পরের ব্যাখ্যাটুকু বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, যেমন— 'প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব (এই আটটি প্রমাণ)॥ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টি তাৎপর্য্য নির্ণয়ের লিঙ্গ॥ অবিধা, লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের বৃত্তি। তন্মধ্যে অভিধা বৃত্তিই মুখ্য। (অবশ্য) যেস্থলে অবিধা অসম্ভব, সেস্থলে লক্ষণা।' এই ব্যাখ্যায় বন্ধনীমধ্যে শব্দগুলো বর্তমান লেখকের। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কেদারনাথ ওপরের শ্লোকে 'অভিধা' শব্দটি

ব্যবহার করলেও, ভাষ্যে অভিধা' ও 'অবিধা' বৃত্তি হিসাবে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মনে হয় কথাটা মূলে 'অভিধা'ই হবে, মুদ্রণ প্রমাদে কয়েক স্থানে 'অবিধা' হয়েছে।

কেদারনাথ আম্নায়সূত্রের উপসংহারে ভণিতা করলেন—

চৈতন্যদেবস্য চতুঃ শতাব্দে
নেত্রাদিকে ভক্তিবিনোদকেন।
আম্নায় মালা প্রভুভক্ত কণ্ঠে
গৌড়ে প্রদাতা হরিজন্মঘস্রে ॥
হরিং বদ হরিং বদ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

এই ভণিতা থেকে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল পাওয়া যাচ্ছে চৈতন্যাব্দ ৪০৩ (নেত্র =৩) অর্থাৎ ১৮৮৯-৯০ সাল। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে রচনা সমাপ্তির অন্তত দু বছর পরে এ গ্রন্থ সজ্জনতোষণীতে ছাপা আরম্ভ হয়।

১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (মাঘ, সন ১৩০০) কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে তদানীন্তন বাংলার একটি মহতী বিদগ্ধ জনসভায় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বৃত্তান্ত—মানচিত্র ও 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণ খণ্ডঃ)' গ্রন্থের মাধ্যমে পেশ করলেন। এ গ্রন্থের কয়েক কপি সভায় বিশেষ বিশেষ অভ্যাগতদের হাতে দেওয়া হয়। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। কেদারনাথ এ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপস্থ 'শ্রীমায়াপুরে'র অবস্থান কোথায় তা বিভিন্ন

প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন। তাঁর উদ্ধৃত গ্রন্থাদির মধ্যে ছিল—ছান্দোগ্য উপনিষদ, মুণ্ডক উপনিষদ, অনন্ত সংহিতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, গর্গ সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মহাভারত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকম্ (রূপ গোস্বামী), ভক্তি-রত্নাকর ইত্যাদি। কেদারনাথ এই সমস্ত উদ্ধৃতি পরিবেশন করতে নিজে সূত্রধারকের ভূমিকা নেন। এ গ্রন্থে তিনি সংস্কৃতে সূত্রধারা রচনা করা ছাড়াও পাদটীকায় বিভিন্ন সংস্কৃত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদও দিয়েছেন।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সূত্রধারায় তিনি লিখেছেন—

নত্বা ব্রজযুবদ্বন্দ্বং তদৈক্যঞ্চ মহাপ্রভুম্।
শ্রূয়তাং ধামমাহাত্ম্যং প্রমাণ-সংগ্রহোদিতম্ ॥ ক ॥
শ্রীনবদ্বীপমুদ্দিশ্য শ্রুতিভির্যৎ প্রকাশিতম্।
তদহং সংগ্রহীষ্যামি বৈষ্ণবানাং সতাং মুদে ॥ খ ॥

অর্থাৎ—'(হে সাধুগণ) আপনারা ব্রজযুবযুগল (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) এবং তাঁহাদের মিলিত তনুস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রমাণসংগ্রহ -গ্রন্থে কথিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ॥ ক ॥ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি বৈষ্ণব-সজ্জনগণের প্রীতির জন্য এস্থলে তাহা সংগ্রহ করিতেছি ॥ খ ॥'

একই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্রধারায় বলেছেন—

পুরাণে বর্ণিতং যদযন্নবদ্বীপপ্রমাণকম্।
অধ্যায়েঽস্মিন্ সমাসেন সংগ্রহীষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ট ॥

অর্থাৎ—'পুরাণসকলে নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত আছে, সম্প্রতি আমি তাহা এই অধ্যায়ে সংগ্রহ করিব ॥ ট ॥'

কিন্তু গ্রন্থ শেষে (৫ম অধ্যায়) শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নবদ্বীপাষ্টক স্তবের অন্ততঃ দুটি শ্লোকের অনুবাদে কিছু ভাষ্য-বৈষম্য আছে বলে মনে হয়। যেমন—

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ১ ॥

কেদারনাথ এই প্রথম শ্লোকের অনুবাদ করলেন—'শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১ ॥' এখানে মনে হয় শ্রীরূপ গোস্বামী 'দীঘি' (বল্লালদীঘি) অর্থে 'দীর্ঘিকায়াঃ' বলেছেন এবং বলেছেন যে সে দীঘি সুর বা দেবলোকের উপযুক্ত। পরের 'অতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ লসন্তম্ আনন্দভরেণ নিত্যং'----'শ্র নবদ্বীপম্'-এর বিশেষণ। কিন্তু অনুবাদে 'অতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ' 'দীর্ঘিকায়াঃ'র (এখানে 'ভাগীরথী' করেছেন) বিশেষণ হয়ে গেছে। বোধ হয় ভাষ্যটি এমন হলেই ভাল হ'ত—'শ্রীগৌড়দেশে সুরলোকের উপযুক্ত দীর্ঘিকা তীরে অতি রমণীয় পুণ্যময়ী নিত্য আনন্দভরে বিরাজমান সেই শ্রীনবদ্বীপ মহানগরী আমি স্মরণ করি'। তবে মনে হয়, তিনি ইচ্ছাপূর্বক এখানে ভাগীরথীর ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

একই স্তবে চতুর্থ শ্লোকে শ্রীনবদ্বীপধাম যে 'শ্রীস্বর্ণদী' (ভাগীরথী) তীরে অবস্থিত তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে —

'শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সুবর্ণসোপান নিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌরবগাহং যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৪ ॥

এখানেও অনুবাদে কিছু অপূর্ণতা আছে বলে মনে হয়। কেদার-নাথ বললেন—'যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাঁহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপানসমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥' কিন্তু 'গৌরবগাহ' ত বাদ পড়ে গেল। গৌর ত বাল্য বয়সে দামাল সাঁতারু ছিলেন, তাঁর গঙ্গায় অবগাহনের কথা সকল চৈতন্য চরিতেই উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এ শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এভাবে হতে পারে—'শ্রীস্বরময় (যার কুলুধ্বনিতে সুমিষ্ট শ্রীরাগ সৃষ্টি হচ্ছে) নদী (ভাগীরথী) যেখানে বিহার করে এবং যে নদীর তট স্বর্ণবর্ণ (গৈরিক মৃত্তিকাময়) সোপানে মণ্ডিত, তরঙ্গব্যাপ্ত যে নদীতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবগাহন করতেন, আমি সেই নদীতীরে অবস্থিত শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীকে স্মরণ করি ॥ ৪ ॥' এই শ্লোকের এখানে তিনি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দেননি, মনে হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে আভাষে মাত্র ভাগীরথীর অবস্থানের ওপরেই জোর দিয়েছেন।

যাই হোক, কদাচিৎ সামান্য কিছু ভাষ্য-বৈষম্য থাকলেও কেদার-নাথের সংস্কৃত রচনা, কি গদ্যে কি পদ্যে, পাঠকের মন কেড়ে নেয়; ভাবকে ভাষা যেন অবলীলায় বহন করেছে। সংস্কৃতে তাঁর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রচনা শ্রীকৃষ্ণসংহিতা। এবার তার আলোচনায় আসা যাক।

কেদারনাথ দত্তের সংস্কৃত ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।' মাত্র ৪১ বছর বয়সে, প্রবীণতার প্রারম্ভেই এই গূঢ়ার্থক বিদগ্ধ রচনা (১৮৭৯) প্রাজ্ঞজনের এতই সানন্দে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল যে প্রথম প্রকাশের (১৮৮০) স্বল্পকালের মধ্যেই সকল কপি নিঃশেষ হয়ে

যায়। ২৬ বছর পরে প্রথমে সজ্জনতোষণী পত্রিকার ১৫শ খণ্ডে (১৯০৫) 'সঙ্গিনী' (সংযোজনী) হিসাবে এবং সেই বছরেই পরে পুস্তকাকারে এই গ্রন্থের গ্রন্থকার কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আরও অনেক সংস্করণ হয়ে গেছে।

গ্রন্থ-প্রারম্ভে ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (ভূমিকায়) কেদারনাথ লিখেছেন,—'আর্য্যশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমি 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। বৈষ্ণবতত্ত্বই আর্য্যধর্ম্মের চরমাংশ।... উপক্রমণিকায় ধর্ম্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচার লক্ষিত হইবে। উপসংহারে আধুনিক পদ্ধতিমতে তত্ত্ববিচার করা হইয়াছে।... যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা পূর্ব্বক উপক্রমণিকায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও কালসম্বন্ধে যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিলে পরমার্থের লাভ বা হানি নাই।...যুক্তিদ্বারা ইতিহাস বা কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দারা ক্রমশঃ পরমার্থ সম্বন্ধেও অনেক উন্নতি আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাসনদীতে যুক্তিস্রোত সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবালসকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটি স্বাস্থ্যলাভ করিবে। উপক্রমণিকার স্বাধীন সিদ্ধান্ত দেখিয়া পূজ্যপাদ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ ও সাত্বত মহোদয়গণ শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনাদর না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

সে যুগে এতখানি সাহসিকতা নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসহ ধর্মতত্ত্বের আলোচনা আর মাত্র দু জন করেছিলেন,—প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে 'ঋগ্বেদসংহিতা' অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় দীর্ঘ ৮৩

পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলা গদ্যে কেদারনাথ উপক্রমণিকার কলেবরে ভারতের আর্যযুগের প্রারম্ভ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের কাল পর্যন্ত ইতিহাস বিধৃত করেছেন এবং তারই মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্বের সমন্বয় করেছেন। সম্ভবতঃ এটিই বাংলা ভাষায় বাঙালীর লেখা প্রথম মৌলিক ভারত ইতিহাস, যদিও পরবর্তী বাঙালী ইতিহাস লেখক ও পাঠকদের কাছে এই অনবদ্য নাতিদীর্ঘ ইতিহাসটি অজানিত থেকে গেছে। রমেশচন্দ্র দত্তের সর্বপ্রথম বাংলায় লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বলে সুপরিচিত গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অব্যবহিত পরে ১৮৮০ সালেই লেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র তাঁর অধস্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বয়োজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত ভক্ত কেদারনাথের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কেদারনাথের অসুস্থতার সময় সুবিধাজনক স্থানে বদ্‌লীর ব্যবস্থা করেছিলেন ('আত্মজীবন চরিত', ১৮৯৬, ১৮৮-৮৯ পৃঃ)।

কেদারনাথ শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপক্রমণিকায় বলেছেন,—'ভারতবর্ষের অতি পূর্ব্বতম ইতিহাস বিস্মৃতিরূপ ঘোরান্ধকারে আবৃত আছে, কেননা প্রাচীনকালের কোন আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস নাই। চতুর্ব্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসকলে যে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিয়া যাহা পারি স্থির করিব।'

মূল সংহিতা অংশ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা পৃথকভাবে শুরু হয়েছে। মোট শ্লোক সংখ্যা ২৮১। প্রতি শ্লোকের বাংলা গদ্যে ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া আছে (মোট ৮৮ পৃষ্ঠা)। এর পরে শেষে ৫১ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ উপসংহার।

এই সুললিত সুঝঙ্কৃত শ্লোকলহরীর প্রথম অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠ বর্ণনার শেষে কেদারনাথ লিখেছেন,—

যস্যেহ বর্ত্ততে প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজবিলাসিনি।
তস্যৈবাত্মসমাধৌ তু বৈকুণ্ঠো লক্ষ্যতে স্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

তিনি এর ভাষ্য করলেন,—যে সকল উত্তমাধিকারিগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারীদিগের ইহাতে সামর্থ্য হয় নাই। যেহেতু শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা এতত্তত্ত্ব গম্য হয় না। কোমলশ্রদ্ধেরা শাস্ত্রকে একমাত্র প্রমাণ জানেন এবং ব্রহ্মচিন্তকাদি যুক্তিবাদীরা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে অশক্ত ॥ ৩৪ ॥'

কেদারনাথ বলেছেন যে ভক্ত দুরকম হতে পারে—সারগ্রাহী (উত্তমাধিকারী) ও কোমলশ্রদ্ধ (মধ্যমাধিকারী)। সারগ্রাহী ভক্ত সারগ্রহণ করেন, কিন্তু যুক্তি অবলম্বনে ভক্তির একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। কোমলশ্রদ্ধ ভক্তের একমাত্র অবলম্বন বিশ্বাস, যা যুক্তির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বিজ্ঞান (বৈশিষ্ট্য) বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—

সা শক্তিঃ সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তা-স্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা-সত্তা রূপ-সত্তা কলেবরম্।
রাধাদ্যাসঙ্গিনী সত্তা সর্ব্বসত্তা তু সন্ধিনী ॥ ৪ ॥

তিনি এর ব্যাখ্যায় বললেন—'ব্রহ্মের পরাশক্তির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী পরব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ যে সচ্চিদানন্দ, তাহাই সৎ (সন্ধিনী), চিৎ (সম্বিৎ), আনন্দ (হ্লাদিনী)—এই তিনটি ভাবসংযুক্ত। প্রথমে পরব্রহ্ম ছিলেন, পরে স্বশক্তি প্রকাশদ্বারা সচ্চিদানন্দ হইলেন, এরূপ কালগত ভাব পরতত্ত্বে কখনই অর্পণ করা উচিত নয়। স্বচ্চিদানন্দ-স্বরূপই অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বলিয়া সারগ্রাহীদিগের বোধ্য। সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদয় হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা....ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনীসম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব।···চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী ভাবগত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ॥ ৩॥ তাঁহার অভিধাসত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম, রূপসত্তা কৃষ্ণ-কলেবর, সন্ধিনী ও রূপসত্তার মিশ্রভাব হইতে রাধাদি প্রেয়সী॥ ৪॥'

কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে অবতার-লীলার সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে বর্তমান যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর আধুনিকতা নিয়ে সে যুগে তিনি বলেছেন (৩য় অধ্যায়),—

যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ॥৫॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবো হি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ॥৬॥
নৃসিংহো মধ্যভাবো হি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা॥৭॥

সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
তর্ক নিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ ॥৮॥

সৃষ্টিকাল থেকে জীব-বিবর্তনের ধারানুযায়ী দশটি কালে দশ অবতার আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিলেন,—'মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন ॥ ৫ ॥ জীব যখন মৎস্যাবস্থা-প্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য ('জেলিফিস') নির্দ্দণ্ড (spineless); নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা (fixed. spine) হইলে কূর্ম্মাবতার; বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন ॥ ৬ ॥ নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় (আদিবাসী) পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র ॥ ৭ ॥ মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৮ ॥'

একই অধ্যায়ে পরে আবার বললেন,—

সর্ব্বেষামবতারাণামর্থো বোধ্যো যথা ময়া।
কেবলং কৃষ্ণতত্ত্বস্য চার্থো বিজ্ঞাপিতোঽধুনা ॥ ১৮ ॥

এর ভাব বিস্তার করলেন,—'সম্প্রতি এই গ্রন্থে যেরূপ কৃষ্ণতত্ত্বের তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপিত হইবে, অন্যান্য অবতার সকলের অর্থও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মরূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন।…কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিদ্বিলাসরতি জীবের হৃদয়ে

উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না, অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষের বীজস্বরূপ ॥ ১৮ ॥'

এর পরের অধ্যায়ে (৪র্থ) কেদারনাথ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথায় বলেন,—

ব্রজভূমিং তদানীতঃ স্বরূপেণাভবদ্ধরিঃ।
সন্ধিনীনির্ম্মিতা সা তু বিশ্বাসো ভিত্তিরেব চ ॥ ১০ ॥

এর ভাষ্য করলেন,—'চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যুক্তিবিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকেনা কিন্তু বিশ্বাসবিভাগেই তাহার অবস্থান হয় ॥ ১০ ॥'

এরপর আরও তিনটি অধ্যায় নিয়ে (৫ম-৭ম) আছে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বর্ণনা। ৭ম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তিনি বললেন,—

বিদন্তি তত্ত্বতঃ কৃষ্ণং পঠিত্বেদং সুবৈষ্ণবাঃ।
লভন্তে তৎফলং যত্তু লভেদ্ভাগবতে নরঃ ॥ ১১ ॥

আর ভাষ্যে বললেন,—'সমস্ত সুবৈষ্ণবগণ এই কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার যে সমস্ত ফল ভাগবতে কথিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ফলই এই গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিলে লব্ধ হয় ॥ ১১ ॥'

পরের অধ্যায়ে 'ব্রজভাবসকলের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা' বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (৮ম অধ্যায়)। তিনি রাগতত্ত্বকে বিস্তার করে বলেছেন,—

শ্রীগোপী-ভাবমাশ্রিত্য মঞ্জরী-সেবনং তদা।
সখীনাং সঙ্গতিস্তস্মাৎ তস্মাদ্রাধাপদাশ্রয়ঃ ॥ ১১ ॥

এই গভীর তত্ত্বের বিস্তারে বলেন,—'উপাসনাপর্ব্বে রাগতত্ত্বকে অবস্থাক্রমে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—শুদ্ধরাগ, বৈকুণ্ঠ সত্ত্বাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং বদ্ধজীবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টাগত ভাব-মিশ্রিত রাগ। কৃষ্ণার্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্ত্বাগত অতিশুদ্ধরাগকে মহাভাব বলা যায়। রাগের তদবস্থা হইতে ভিন্ন, কিন্তু মহাভাবের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ শুদ্ধসত্ত্বাগত অষ্টপ্রকার ভাগসকল অষ্ট সখী। উপাসকের নিদর্শন চেষ্টাগত সখীভাবের সন্নিকর্ষ-ভাবসকল মঞ্জরী (সেবিকা)। উপাসক প্রথমে স্বীয়স্বভাবপ্রাপ্য মঞ্জরী আশ্রয় করিয়া, পরে ঐ মঞ্জরীর সেব্যা সখীর আশ্রয় করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় লাভ হইবে। মহারাসলীলাচক্রে উপাসক, মঞ্জরী, সখী, ও শ্রীমতী রাধিকা—ইহাঁরা জড়জগতের ধ্রুবচক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য্য ও ধ্রুব—ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখেন ॥ ১১॥

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রজলীলার রাগতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমতত্ত্ব প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আত্যন্তিক চর্চার ফলেই সহজিয়া ধারার উৎপত্তি হয়েছে। কেদারনাথ আজীবন এই অপপরিণতির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি এখানে অষ্টম অধ্যায়ের শেষের দিকে বলেছেন যে সুবৈষ্ণবের নিজের মধ্যে সাযুজ্যভাব (নিজেকে ভগবান মনে করা) তার পতনের কারণ। যেমন—

ভক্তিতেজো সমৃদ্ধ্যা তু স্বোৎকর্ষজ্ঞানবান্ নরঃ।
কদাচিদ্দুষ্টবুদ্ধ্যা তু কেশিঘ্নমবমন্যতে ॥ ২৯ ॥

তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন,—'সাধকের যখন ভক্তিতেজ সমৃদ্ধি হয় তখন স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞান রূপ ঘোটকাত্মা কেশী নামক অসুর আগমন করত বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকৃষ্টতা আলোচনা করিতে করিতে ভগবদমাননা-ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্ণবকে অধঃপতন করায়। অতএব তদ্রূপ দুষ্টভাব বৈষ্ণবহৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ভক্তিসমৃদ্ধি হইলেও নম্রতা ধর্ম্ম কখনই বৈষ্ণবচরিত্র ত্যাগ করিবে না ॥ ২৯ ॥'

নবম অধ্যায়ে কেদারনাথ শ্রীকৃষ্ণাপ্তি (শ্রীকৃষ্ণসমাধিতত্ত্ব) বর্ণনা করেছেন। সেখানে সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে নির্বিকল্প ও কূটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলেন। দশম অধ্যায়ে তিনি 'কৃষ্ণাপ্তজনচরিত্রম' আলোচনায় 'অর্থ' ও 'পরমার্থ' ব্যাখ্যায় বললেন,—

অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থপ্রয়োজকঃ।
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঃ ॥ ১৪ ॥

তিনি এই শ্লোককে দীর্ঘ ভাষ্যে সুবিস্তার করলেন,—'শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্পশাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই অর্থশাস্ত্র। ঐ সকল দ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক, সংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়, ঐ উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া। গীতশাস্ত্র দ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখ-রূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।...এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত।...স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়,

যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থ ই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎরূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না।...পরমার্থ নির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। নানাবিধ সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্তশোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন ॥১৪॥'

এই অনবদ্য রচনার সবটুকুই সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু আগাগোড়া মূল রচনা স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল হওয়ায় গ্রন্থটি সুখ-পাঠ্য হয়েছে। তাত্ত্বিক মতামত সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার অধিকার বর্তমান গ্রন্থকার রাখেন না। ভাষা-ছন্দ, ব্যাকরণগত ও আলঙ্কারিক সম্ভাব্য ত্রুটি সম্পর্কে কেদারনাথ নিজেই সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব পরিবেশনে আন্তর রূপের ওপরই জোর দিয়েছেন, বাহ্যরূপ সম্বন্ধে ত্রুটিবিচ্যুতি অগ্রাহ্য করেছেন। তাই তিনি দশম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন,—

পরমার্থবিচারৈরেহস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহী জনোর্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

—'এই গ্রন্থে পরমার্থ বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষসমুদয় গ্রাহ্য।...এই গ্রন্থ আলোচনা সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্যদোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসার গ্রহণরূপ এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন ॥ ১৯ ॥

এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে কেদারনাথের বিশাল সংস্কৃত রচনার

আলোচনা এখানেই শেষ করা গেল। এই সঙ্গে সুপণ্ডিত দার্শনিক ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও দেশবরেণ্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য পুনরায় উল্লেখ করা যাচ্ছে। ডঃ দত্ত ১৯১৬ তে ভক্তিবিনোদ স্মরণ সভায় বলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ··এই মহাপুরুষের (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) আবির্ভাবের ফলে সেই সত্যবাণী দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।' শ্রীপাল একই সভায় বলেন—'শ্রীভক্তিবিনোদের 'কৃষ্ণসংহিতা' পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার তুল্য সিদ্ধান্ত আর নাই।' (স, তো, ২য় পর্যায়, ১৯শ বর্ষ ১৯১৬)। এর পরে নিতান্ত স্বল্প পরিসরে কেদারনাথের ইংরাজি রচনার আলোচনা করা হ'ল।

—বারো—

ইংরাজি সাহিত্য

কেদারনাথ দত্তের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিপুল পরিমাণ রচনার তুলনায় তাঁর ইংরাজি ভাষায় রচনার পরিসর অনেক কম। কিন্তু ইংরাজি রচনা স্বল্প হলেও অপাংক্তেয় নয়। তাঁর চারটি প্রধান রচনার মধ্যে দুটি (Poriade : I & II ও Maths of Orissa) মাত্র বাইশ বছর বয়সের পূর্বেই ছাপা হয়েছিল। তৃতীয় প্রধান রচনা 'Speech on Bhagabat' মাত্র ৩১ বছর বয়সে ১৮৬৯ সালে ছাপা হয়।

এই গভীর তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক পুস্তিকাটি কেদারনাথের পরবর্তী প্রকাশকগণ 'The Bhagavata, its Philosophy, Ethics and Theology' রূপে প্রকাশ করেন। তাঁর পরিণত বয়সের প্রধান ইংরাজি রচনা 'Sree Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts' (১৮৯৬)। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতাগুচ্ছ—'Reflections' (১৮৭১)।

বাল্যাবধি ডিজার বারেট, ডেভিড ফারলঙ, প্রিন্সিপাল ক্লিন্ট, রেভারেণ্ড ডাফ ইত্যাদি শিক্ষিত সাহেবদের কাছে শিক্ষা পাওয়ায়, নিয়মিত শিক্ষালয়ের বাইরে অনেক সময় তাঁদের সঙ্গ করায় এবং প্রচুর ইংরাজি গ্রন্থ পঠনপাঠন ও আলোচনা করায়, কেদারনাথ ইংরাজি ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মত রপ্ত করেছিলেন। বক্তৃতাদিতে ও কলমের মুখে তাঁর ভাবপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল ছিল। সাহিত্যানুগ প্রকাশ হলেও কোথাও আবিলতা ছিলনা। শিক্ষিতের মৌখিক ভাষা রপ্ত করেছিলেন বলে, ভাষা যুগের প্রভাবে 'ভিক্টোরীয়' হয়ে ওঠে নি, বরং তুলনায় তাতে পরবর্তী যুগের আধুনিকতার ছাপ ভালভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য তরুণ বয়সে নিয়ত ইংরাজি চর্চার ফলে ভাষায় যে স্বাভাবিক ধার এসেছিল, পরিণত বয়সে সদাসর্বদা বাংলা ও সংস্কৃত, লেখা ও পড়ার মধ্যে ডুবে থাকার দরুণ ইংরাজিতে এই প্রকাশ-তীক্ষ্ণতায় কিছুটা মন্দা এসেছিল বলে মনে হয়।

'পোরিয়েড' কাব্য রচনাকাল (১৮৫৬-৫৭) সম্বন্ধে কেদারনাথ তাঁর আত্মজীবন চরিতে (১৮৯৬) লিখেছেন,—'আমি অঙ্কবিদ্যায় চিরদিনই অপটু।···আমার সাহিত্যে এত অধিকার ছিল যে আমি সমস্ত

ক্লাশ ও মাষ্টারদিগের প্রিয় ছিলাম। আমি যে পোয়ট্রি রচনা করিতাম তাহা মাষ্টারদিগের ও ক্রমশঃ প্রিন্সিপাল ক্লিন্ট সাহেবের গোচরে আসিল। ···আমি ১৮৫৬ সালের শেষভাগে আমার পোরিয়েড প্রথম ভাগ লিখি। গঙ্গাচরণ সেন মহাশয় পড়িয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার পরামর্শ মতে পরে ক্রমশঃ আমি ঐ দুই অংশ ছাপিয়াছিলাম। রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব উহা পাঠ করিয়া বলিলেন কবিতা ভাল হইয়াছে।··· (আমি তখন) ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়া লাইব্রেরী গেজেট কাগজে ছাপাই। এ. বি. সি. বলিয়া আমার সংজ্ঞা ছিল।··· কোন দিবস আমার একটি কবিতা দেখিয়া মিসেস্ লক আমাকে ডাল (পাদরী) সাহেবের দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন।....তিনি আমার কবিতার প্রশংসা করিয়া আমার পোরিয়েড গ্রন্থ অঙ্গীকার করিলে আমি তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম।' (আ, জী, চ, পৃষ্ঠা, ৬৮-৭২)।

'Maths of Orissa' গ্রন্থটি ক্ষুদ্র এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সের রচনা হলেও এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর 'Imperial Gazetteer' এর উড়িষ্যা খণ্ডের ইতিহাসে কেদারনাথের এই ক্ষুদ্র গবেষণাগ্রন্থের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন (১৮৭২) এবং যার ফলে কেদারনাথকে লণ্ডনের, 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য (M. R. A. S.) করে নেওয়া হয় ১৮৮৬ সালে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কেদারনাথ তাঁর আত্মজীবন চরিতে লিখেছেন,—'যখন পূর্বে (১৮৬০) আমি ভদ্রকে মাষ্টার ছিলাম তখন ডিয়ার সাহেব ডেপুটি (ম্যাজিষ্ট্রেট) ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া সব-ডিবিসন্যাল

রেসিডেন্স কুটীতে লইয়া যাইতেন। আমি সেই কুটীতে বসিয়া মটস্ অব উড়িষ্যা বলিয়া একখানি ছোট ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। ডাঃ হাণ্টার তাঁহার উড়িষ্যা ইতিহাসে আমার ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন'(পৃঃ ১৫০)। এখানে ঐ গ্রন্থ থেকে রচনার কিছু নমুনা দেওয়া গেল,—

'The system of Jagannath is viewed in two different ways. The superstitious and the ignorant take it as a system of idolatory by worshipping in the shape of a carved wood for the salvation of the Oriyas. But the Saragrahi Vaishnavas find the idols as emblem of eternal truth which has been explained in the Vedanta Sutras of Vyasa.

'The temple (of Puri) was erected by Raja Ananga Bhimdeb about 800 years ago in place of another one, then in a state of dilapidation. In old accounts we find this temple styled as Niladri or the Blue Hill. From this it appears that the former temple which was probably raised by the emigrating Raja Indradyumna was a blue or dark coloured one. ...The Utkalkhanda in the puranas, the Niladri Mahodadhi and the Matha Panjee (an account regularly kept by the temple officers)

declare that Jagannath is a very ancient institution amongst the Hindus. Whatever may be the value of the authorities quoted, we are inclined to believe that Puri was considered secred even at the time when the Puranas were written, because we find in the Wilson's copy of Vishnu Purana that one Kandu Rishi resorted to a place called Purushottama for the purpose of divine contemplation. At all events Raja Indradyumna, to whom the whole affair is generally ascribed lived a long time before Raja Vikramaditya the contemporary of Augustus Ceasar of Rome. We are sure, that Puri is not so old as Beneras and Gaya, of which repeated mention is made in all the Puranas and the Mahabharata, yet it is not a place of recent origin created after the commencement of the Christian era.

এই গ্রন্থে তিনি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, উড়িষ্যার বিভিন্ন মঠ মন্দিরে (বিশেষ করে জগন্নাথ মন্দির, টোটা গোপীনাথ, সাক্ষীগোপাল, সিদ্ধ-বকুল, গম্ভীরা, ইত্যাদি) সেবা-পূজায় নিয়মবিরুদ্ধ অবহেলা ও বিশৃঙ্খলার চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরে-ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশ ভক্ত ও বিদ্বজন সমাজে এতই আলোড়ন

সৃষ্টি করে যে, পরে তিনি পুরীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসে জাল -অবতার বিষকিষণের মুখোশ খুলে তার দণ্ডবিধান করার পর, তাঁকে জগন্নাথ মন্দিরের অধ্যক্ষপদে (Administrator) নিযুক্ত করা হয়।

১৮৫৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলো তিনি ১৮৭১ সালে একত্র করে 'Reflections' নামে প্রকাশ করেন। এবার এখানে Reflections থেকে কিছু কিছু তুলে ধরা গেল,—

'There rests my soul from matter free
Upon my Lover's arms,
Eternal peace and Spirit's love
Are all my chanting charms.'

....

'The flesh is not our own alas !
The mortal frame a chain ;
The soul confined for former wrongs
Should try to rise again !!
Why then this childish play in that
Which cannot be our own,
Which falls within a hundred years,
As if a rose ablown !'

... .

'So push thy onward march O soul !
Against an evil deed

That stands with soldiers—hate and lust!
A hero be indeed !!
Maintain thy post in spirit-world
As firmly as you can,
Let never matter push thee down,
O stand heroic man!'

—*Saragrahi Vaishnava.*

প্রথম লেখাটির ভাবে ভাষায় পশ্চিমী পরিচিত রোমান্টিকতা থাকলেও, পরেরটিতে এবং আরও অনেক কবিতায় ইংরেজ রসপিপাসুরা পেয়েছিলেন তাঁদের পরিচিত ভাষায় একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন সুর—প্রাচ্য আত্মনিবেদনের বাণী ; যেটা তাঁদের আকর্ষণ করেছিল ও মুগ্ধ করেছিল।

তরুণ বয়সে কেদারনাথের ইংরাজি রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষার আধুনিকতা। যখন সেকালে মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগে কি ইংরাজ, কি ভারতীয়, সকলেই রাশভারী শব্দ-প্রধান আলঙ্কারিক পোষাকী ইংরাজিতে প্রচলিত ধারায় রচনা করতেন, কেদারনাথ তখন আশ্চর্যজনকভাবে সাবলীল শিক্ষিত ইংরাজের কথ্যভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং তাকেই নিজের গভীরতর তত্ত্ব প্রকাশেরও বাহন করেছেন। এ ভাষা বিষয়বস্তুকে সরাসরি মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, কোন ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন হয় না। তাঁর লিখিত ভাষার আত্যন্তিক অধুনিকতা এদেশে সেকালের উচ্চশিক্ষিত

ইংরাজকেও বিস্মিত ও অভিভূত করত। অধ্যাপক ডিজারবারেটের মত মত লোকও প্রকাশ্য প্রশংসা করতে সংকোচ বোধ করতেন না। কেদারনাথ তাঁর আত্মজীবন চরিতে লিখেছেন,—'তিনি আমার অধিক প্রশংসা করায় বাবা তাঁহাকে আমার সম্মুখে প্রশংসা করিতে নিষেধ করিলেন। এই সকল প্রশংসাবাদ শুনিয়া আমার মনটা উচ্চ হইল। এমত কি অতি শীঘ্রই আমার লেখাপড়া কচুপোড়া খাইয়া গেল' (পৃঃ২৮)। এর পর কেদারনাথকে ইংরাজি বলার ও লেখার নেশায় পেয়ে বসল। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই—'আমি গোরা-পল্টন পড়িলে সাহেবদের সহিত কথোপকথন করিতে যাইতাম' (পৃঃ ৫৬) ;—যে বয়সে অন্য বালক লালমুখো দেখে ভয়ে কেঁদে বাড়ী পালাতো।

তিনি লিখেছেন,—'কাশীবাবুর (কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ) হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার কাগজে কিছু কিছু ইংরাজি লিখি (১৮৫৪)। তিনি আমার রচনা শোধন করিয়া দেন। ...আমি ইংরাজিতে কিছু কিছু বক্তৃতা করি। ঐ সময় কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভু মুখোপাধ্যায় আসিয়া ইণ্টেলিজেন্সার কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।... (শম্ভুর) লেখায় অনেক তীব্র শব্দ প্রয়োগ থাকায় লেখা অনেক সময় পছন্দ হইত না। কৃষ্ণদাস প্রথমে রচনা লেখার মত লিখিতে লাগিলেন' (পৃঃ৬৫)। 'মেটকাফ হলে (পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) প্রত্যহ গিয়া পুস্তকাদি পাঠ করি।...অনেক সভায় বক্তৃতাদি করি। পাদ্রী ডাল সাহেব ও জর্জ টম্পসন সাহেবের কাছে বিদ্যার আলোচনা করি। টম্পসন সাহেব আমাকে কিরূপে বক্তা হইতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন'(পৃঃ৭০)।

এমন উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু এবার কেদারনাথের নিজের সম্বন্ধে নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে তাঁর লেখা ধরেই নিরপেক্ষভাবে তাঁর ইংরাজি সাহিত্যের মূল্যায়ন করা যাক। আজও যে-কেউ তাঁর ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 'Speech on Bhagabat' (বর্তমান সংস্করণে 'The Bhagavata: Its Philosophy, Ethics & Theology') পড়বেন, ভাষার আধুনিকতা, যুক্তির গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি প্রকাশের সংযমের মধ্যেই অপূর্ব সরসতা তাঁকে অভিভূত করে দেবে। এত গুরুগম্ভীর বিষয়ের ওপর লেখা যে এতখানি আকর্ষণীয় হতে পারে তা পড়ার আগে ভাবাই যায় না। সে যুগে অন্যদের লেখার তুলনায় তাঁর সমালোচনাও কী শালীনতা মণ্ডিত! তিনি লিখলেন,—

Men of brilliant thoughts have passed by the work in quest of truth and Philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct, prevented them from making a candid investigation. Not to say of other people, the great genius of Raja Ram Mohan Roy, the founder of the sect of Brahmoism, didnot think it worth his while to study this ornament of the religious library..... Ram Mohan Roy was as able man. He could not be satsified with the theory of illusion contained in

চাতুর্মাস্য ব্রত পালনে কেদারনাথ দত্ত
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
—১৮৯৪—
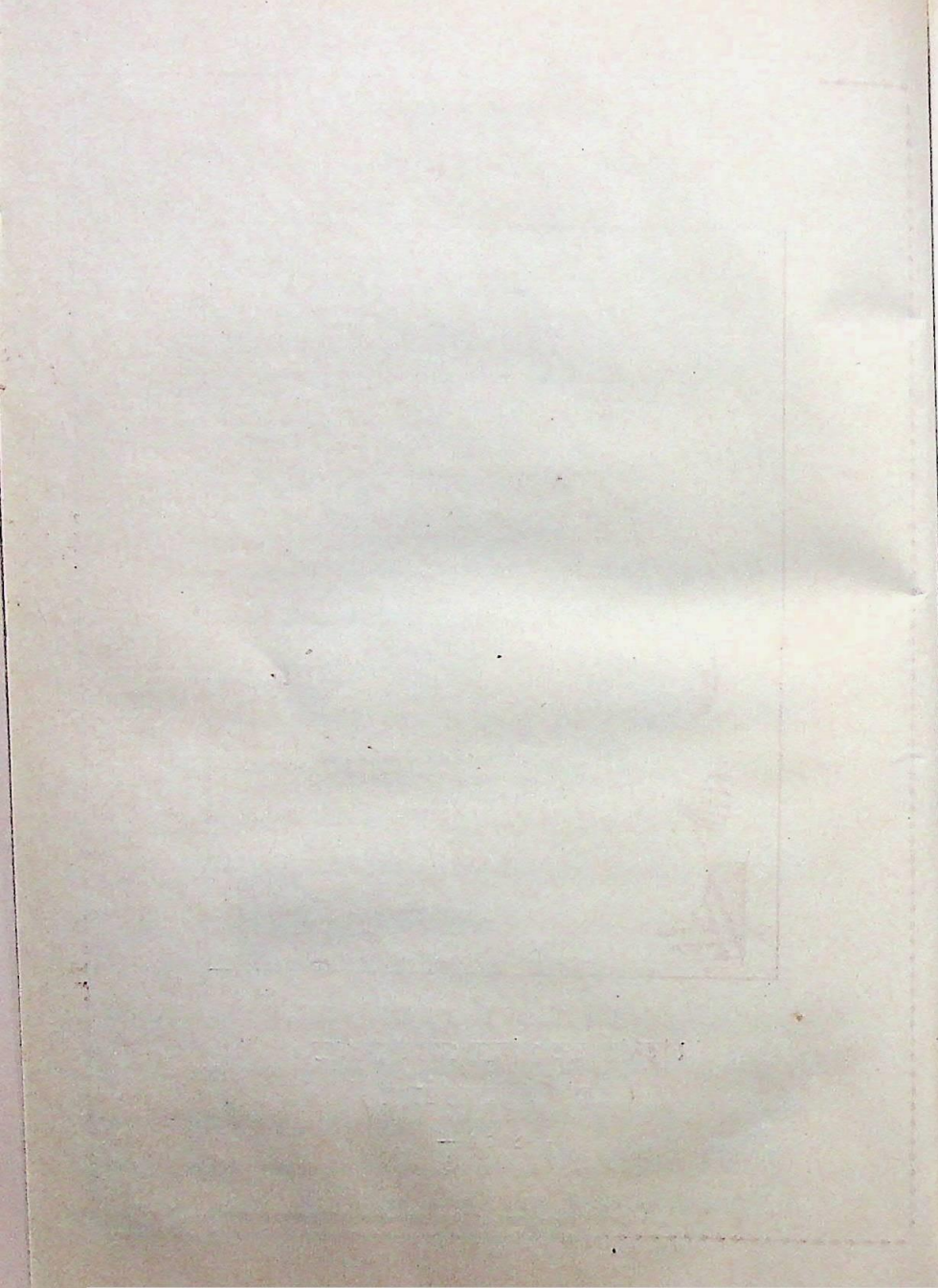
the Mayavada Philosophy of Shankar. He ran furious from the bounds of Shankar to those of the koran. There even he was not satisfied. He then studied the pre-eminently beautiful precepts and history of Jesus,…took shelter under the holy banners of the Jewish Reformer. But Ram Mohan Roy was also a patriot. He wanted to reform his country in the same way as he reformed himself. On these grounds he claimed the truths inculcated by the Western Saviour as also the property of himself and his countrymen, and he established the Samaja of the Brahmos independently of what was in his own country in the Beautiful Bhagavat' (*The Bhagavat*, 2nd ed., 1959, pp. 3-5).

কেদারনাথ নিজেই ভাগবত সম্বন্ধে প্রথম জীবনে যথেষ্ট বিরূপ ছিলেন। কিন্তু কৌতূহল বশে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীর অনুসরণ করতে গিয়ে আচম্‌কা এক বিরাট রসতত্ত্ব ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই তিনি লিখেছেন,—

'When we were in the college, reading the philosophical works of the West and exchanging thoughts with the thinkers of the day, we had a real ha-

tred towards the Bhagavat. That great work looked like a repository of wicked and stupid ideas....and we hated to hear any argument in its favour. To us then a volume of Channing, Parker, Emerson or Newman had more weight than the whole lots of the Vaishnav works. Greedily we poured over ... the labours of the Tattwa Bodhini Sabha, containing extracts from the Upanishads and the Vedanta, but no work of the Vaishnavs had any favour with us....Accidentally, we fell in with a work about the Great Chaitanya, and on reading it with some attention in order to settle the historical position of that Mighty Genius of Nadia, we had the opportunity of gathering His explanations of Bhagavat, given to the wrangling Vedantist of the Benares School. The accidental study created in us a love for all the works which we find about our Eastern Saviour. ....Oh ! What a trouble to get rid of prejudices gathered in unripe years !' (pp.7-8)

এই প্রসঙ্গে আত্মজীবন চরিতে যে কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে তা এখানে প্রাসঙ্গিক হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,—

'চৈতন্যচরিতামৃত প্রথমবার পাঠ করিয়া (দিনাজপুর ১৮৬৮তে) চৈতন্যে কিছু শ্রদ্ধা জন্মিল। দ্বিতীয়বার পাঠ করিলে বুঝিলাম যে চৈতন্যের তুল্য পণ্ডিত ছিল না। তখন সন্দেহ হইল যে এরূপ পণ্ডিত হইয়া এবং এতদূর প্রেমবস্তু অনুভব করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু কিরূপে কৃষ্ণের অন্যায় চরিত্রের উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। আমি প্রথমে আশ্চর্য হইয়া চিন্তা করিলাম। পরে ভগবানকে অনেক দৈন্যের সহ বলিলাম—প্রভো! ইহাতে যে গূঢ় কথা অছে তাহা আমাকে জানিতে দাও। ভগবানের দয়া অসীম। আমাকে সরলতার সহিত্য ব্যস্ত দেখিয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই আমাকে কৃপা করিয়া বুদ্ধিযোগ দিলেন। তখন আমি জানিলাম যে কৃষ্ণতত্ত্ব অতিশয় গূঢ় এবং ভগবত্তত্ত্বের চরম প্রভাব। ঐ সময় হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে আমার ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিল' (আ, জী, চ, পৃঃ ১২৯-৩০)।

যেখানে কেদারনাথ গম্ভীরভাবে সমালোচকদের সমালোচনা ধারার পর্যালোচনা করেছেন, সেখানে যেমন তাঁর ভাষা শৈলী, তেমমি তাঁর যুক্তি গভীরতা। তিনি বলেছেন,—

'The true critic is a generous judge, void of prejudices and party-spirit. One, who is at heart the follower of Mahamed will certainly find the doctrine of the New Testament to be a forgery by the fallen angel. A Trinitarain christian, on the other hand, will denounce the precepts of Mahamed as those of na ambitious reformer. The reason sim-

ply is, that the critic should be of the same disposition of mind as that of tue author, whose merits he is required to judge' (The *Bhagavat* p. 8).

আবার যেখানে পাশ্চাত্যবাসীর ভাগবত সম্বন্ধে চূড়ান্ত অজ্ঞতার কথা বলেছেন, সেখানে এই গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রচুর রসসৃষ্টি করেছেন। যেমন,—

'What sort of a thing is the Bhagavat, asks the European gentleman newly arrived in India. His companion tells him with a serene look, that the Bhagavat is a book, which his Oriya bearer daily reads in the evening to a number of hearers. It contains a jargon of unintelligible and savage literature of those men who paint their noses with some sort of earth or sandal, and wear beads all over their bodies in order to procure salvation for themselves. Another of his companions, who has travelled a sittle in the interior, would immediately contradict him and say that the Bhagavat is a Sanskrit work claimed by a sect of men, the Goswamis, who give Mantras, like the Popes of Italy, to the common people of Bengal, and pardon their sins on payments of gold,

enough to defray their social expenses. A third gentleman will repeat a third explanation. Young Bengal, chained up in English thoughts and ideas, and wholly ignorant of pre-Mohamedan history of his own country, will add one more explanation by saying that the Bhagavat is a book, containing an account of the life of Krishna, who was an ambitious and an immoral man!' (pp. 11-12).

কিন্তু এসব হালকা রসের পরে তিনি যখন সশ্রদ্ধভাবে ভাগবতের স্বরূপ স্বল্প কথায় তুলে ধরলেন তার মাধুর্য ও গভীরতা সকল পাঠকেরই অন্তর স্পর্শ করল, অথচ এখানে সরলতা ও প্রাঞ্জলতার কি মহিমময় সংমিশ্রণ !

'The Bhagavat is pre-eminently **the book** in India. Once enter into it, and you are transplanted, as it were, into the spiritual world where gross matter has no existence. The true follower of the Bhagavat is a spiritual man who has already cut his temporary connection with phenomenal nature, and has made himself the inhabitant of that region where God eternally exists and loves. This mighty work is founded upon inspiration and its super-structure is upon reflection.

To the common reader it has no charm and is full of difficulty. We are, therefore, obliged to study it deeply through the assistance of such great commentator as Shreedhar Swami and the Divine Chaitanya and his contemporary followers.

'You must read the whole Bhagavat for its explanation. When the great Vyasa ahd effected the arrangements of the Vedas and the Upanishads, the completion of the eighteen Puranas with facts gathered from the recorded and unrecorded tradtion of ages, and the cemposition of the Vedanta and the large Mahabharata, an epic poem of great celebrity, he began to ruminate over his own theories and precepts, and found like Fauste of Goethe that he had upto that time gathered no real truth. ....The sage perceived that his former works required supercession in as much as they did not eontain the whole truth ard nothing but the truth..... He commenced the Bhagavat in pursuance of this change.

'The whole of this incomparable work teaches us, according to our Great Chaitanya, the

great truths which compose the absolute religion of man. Our Nadia Preacher calls them *Sambandha*, *Abhidheya* and *Prayojana*, i.e. the relation between the Creator and the created, the duty of man to God and the prospects of humanity. In these three words is summed up the whole ocean of human knowledge as far as it has been explored up to this era of human progress. These are the cardinal points of religion and the whole Bhagavat is, as we are taught by Chaitanya an explanation both by precepts and example, of these three great points (pp. 13-17).

তরুণ বয়সে কেদারনাথ দত্তের ইংরাজি রচনায় যে ধার, যে সাহিত্যিক স্বতস্ফূর্তি ছিল, তা কিন্তু পরিণত বয়সে চর্চার অভাবে বেশ কিছুটা কমে এসেছিল। অবশ্য অপর দিক থেকে বাংলা ও সংস্কৃতে অবিরল তত্ত্বসাহিত্য রচনা ও চর্চার প্রভাবে তাঁর পরবর্তীকালের স্বল্পায়তন ইংরাজি রচনাতেও তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গভীরতা পরিমাণে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাকারে রচনা 'Sree Chaitanya Mahaprabhu, His life and Precepts' (1896, 39p.) .

এখানে প্রারম্ভিক অংশে ভাষা সরল, ভাব যতটা বাস্তবানুগ ততটা সাহিত্যানুগ নয়। যেমন,—

'Most of the books treating on the subject have hitherto been printed in Bengali character. Hence the life and precepts of Chaitanya have scarcely passed beyond the boundaries of Bengal. A book has, therefore, been printed in Sanskrit types for cireulation all over India ..With a view to help our English knowing readers in going through the book, we have here summarised in English the contents of the work.

'Chaitanya Mahaprabhu was born in Mayapur in the towu of Nadia, just after sunset on the evening of the 23rd Falgoon 1407 Sakabda answering to the 18th February (1486) of the Christian Era. The moon was eclipsed at the time of his birth and people of Nadia were then engaged, as usual on such occasions, in bathing in the Bhagirathi with loud cheers of Haribol.....The ladies in the neighbourhood styled him Gourhari on account of his golden complexion and his mother called him Nimai on account of Nim tree near which he was born.....As he grew up he became a whimsical and frolicsome lad.

After his fifth year he was admitted into a Path-shala where he picked up Bengali in a very short time' (5th Edition, 1954, pp.5-6).

এখানে রচনার কয়েকটি দুর্বলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত যদিও তিনি বলেছেন যে লেখাটি প্রধানত 'brethren of Europe and America'র জন্য এবং তাঁদের মহাপ্রভুর precepts এর (নৈতিক চেতদর্শনের) সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্যই রচিত, কিন্তু এটি তিনি শুরু করেছেন যেন ছোটদের একটি জীবনকাহিনী শোনানোর ভঙ্গিতে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বড়দের আকর্ষণ করার মত রচনা শৈলীর অভাব ঘটেছে। এ ছাড়া আগের রচনাগুলোতে যখন তিনি স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি প্রতিশব্দ অথবা অর্থ দিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এখানে ও পরে অনেক জায়গায় বিনা ব্যাখ্যাতেই অবিরত স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, এখানে—Sakabda, Haribol, Nim, Pathshala এবং পরে—Ekadashi, Tol, Smarta, naiyaik ইত্যাদি। এ লেখা থেকে মনে হয় যেন তিনি ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকদের জন্যই রচনা করেছেন, যাঁরা এ সব শব্দের সঙ্গে আগেই পরিচিত।

এ ছাড়া প্রথম দিকের এই অংশেই আর একটি গুরুতর সংবাদ অসংগতি রয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে রচনার প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না, কাজেই এ অসঙ্গতির জন্য মূল লেখক দায়ী, না পরবর্তী সম্পাদক দায়ী তা আজ আর সঠিকভাবে নিরূপণ করার উপায় নেই। শ্রীচৈতন্যের জন্ম-তারিখ যে ২৩ শে ফাল্গুন ১৪০৭ শকাব্দ

তা সেকালের জীবনীকারগণই বলে গেছেন। কিন্তু সেই তারিখ গ্রেগরীয়ান বা জুলিয়ান হিসাবে কোনক্রমেই ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ হতে পারে না আন্তর্জাতিক গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারের হিসাবে তারিখটি হবে ১৪ই মার্চ বুধবার, ১৪৮৬ সাল (দ্রষ্টব্য : 'A study of Sri Chaitanya's Birthplace' by Prof. K. N. Mukherjee in Indian Journal of Landscape Systems, Vol. 7, No II, pp. 33-56 ; আরও দ্রষ্টব্য : 'গৌড়ীয়', মহাপ্রভুর পঞ্চশত বর্ষপূর্তি স্মারক পত্রিকা, ১৯৮৭, পৃঃ 19-26, part II)। অন্যদিকে অধুনালুপ্ত জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের হিসাবে তারিখটি হবে ৪ঠা মার্চ, রবিবার, ১৫৩২ সাল। অবশ্য, সারা পৃথিবীতে এখন গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারই চালু আছে। সম্ভবত কেদারনাথ রচিত এই পুস্তিকার ভুলটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহলে ইংরাজি ঐ তারিখটিকে চালু করেছে। বঙ্গাব্দ অনুযায়ী মহাপ্রভুর আবির্ভাব তারিখ ৩০শে ফাল্গুন, ৮৯২ সন। দোল পূর্ণিমার দিন হওয়াতে তিথি অনুযায়ী কোন গোলমাল নেই।

মহাপ্রভুর জীবনী অংশের সরল ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্তে কেদারনাথ যখন চৈতন্যদেবের তত্ত্বাদর্শের আলোচনায় এলেন, তখন তাঁর ভাষা ও ভাবে অপরিসীম গভীরতা এসে গেল। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় শব্দের অর্থ দিয়েছেন, ফলে, জটিল তত্ত্বের প্রকাশও বিদেশী পাঠকের পক্ষে অনেক প্রাঞ্জল হয়েছে যেমন,—

'Chaitanya, teaches us in the first place that the rational attributes of men are not capable of approaching the Divine sphere of spirit. Jukti as

he styles reason, is quite incompetent in such a matter. Ruchi as he styles the religious sentiment in man, even in a very small quantity, has the power to comprehend it. It is inspiration which can alone give light to spiritual matter.....Human ideas are either mental or spiritual. The mental idea is defective as it has relation to the created principle of matter. The spiritual idea is certainly the nearest approach to the Supreme Being' (pp. 18-20).

'All....attributes together form one supreme power which the Vedas call as Para-shakti. In fact power (shakti) is not distinguishable from the person of that Being. Still the powers are separately exibited in their separate actions. This is styled Achintya-bhedabhed -prakash or inconceivable simultaneous existence of distinction and non-distinction' (p.22).

'Bhakti is a principle which comes from soul and like electricity or magnetism in gross matter, it conducts itself from one congenial soul to another. ...The principle of duty is no part of

Bhakti as it acts as gratitude for favour obtained and it works like an obligation which is contrary to natural love. The principle of morality in the mortal world, though good in its own way, does scarcely give spiritual consequence in the end' (p. 28).

তাঁর এই ইংরাজিতে বিশ্লেষণ, তত্ত্বের জটিলতা সত্ত্বেও বোধকে স্পর্শ করে, বুদ্ধিজীবী ও ভক্ত উভয়কেই সমানভাবে আকৃষ্ট করে। অবশ্য এ বক্তব্যের অধিকাংশই পূর্ব পূর্ব রচনার মত সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে তাঁর এই পুস্তিকাটি রচনাকালে সাহিত্যসৃষ্টির কোন প্রয়াসই ছিল না। একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—সেটি হ'ল মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষাদর্শকে বিদেশীর কাছে তুলে ধরা।

—∞—
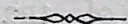
– তেরো –

স্ব-লিখিত জীবনী ও উপসংহার

কেদারনাথ দত্তের রচিত সাহিত্যের মূল্যায়নে ও জীবনীর নির্ভর-যোগ্য সূত্রসন্ধানে তাঁর স্ব-লিখিত জীবনী গ্রন্থটির মূল্য অত্যন্ত অধিক। গ্রন্থটি একটি দীর্ঘ পত্রাকারে তাঁর অষ্টম পুত্র (১০ম সন্তান) ললিতা-প্রসাদ (ললিতাঠাকুর)-কে লিখিত। রচনাকাল ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৬

থেকে ২১শে জুন ১৮৯৬; রচনা ও প্রকাশ স্থান 'ভক্তিভবন', ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল দেওয়া নেই। ললিতা-প্রসাদই প্রকাশ করেন (প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য)। রচনায় কেদারনাথ সন ১২৪৫ থেকে ১৩০১ (১৮৩৮-১৮৯৪) পর্যন্ত, অর্থাৎ জন্ম থেকে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত সময় সবিস্তারে ধরে রেখেছেন। শুধু তাঁর নিজের জীবনই নয়, জীবন্তভাবে সেকালের অনেক ব্যক্তি ও সমাজচিত্রও এতে ধরা আছে। অথচ আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিবৃত্তকার বা চরিতসাহিত্যের ইতিহাসকার এ গ্রন্থের বা কেদারনাথের উল্লেখটুকুও করেননি। গ্রন্থটি এতই দুষ্প্রাপ্য যে, কিছু পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব রচনাকার তাঁদের গ্রন্থে এই গ্রন্থটি থেকে পৃষ্ঠা উল্লেখ না করে বিভিন্ন অংশ থেকে টুকরো টুকরো তুলে নিয়ে সেগুলো জোড়াতালি দিয়ে অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এঁরা অনেকেই প্রতিপত্তিসম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁদের রচনায় ভেজাল সন্দেহ করার কারণ ছিলনা।

১৮৮০ তে কেদারনাথের সটীক সংস্কৃত কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' প্রকাশের পর শুধু দেশেই নয় বিদেশেও রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। বইটি পড়ে বিলাতের বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ব বিশারদ ও ভাষাতাত্ত্বিক Dr. Reinhold Rost, C I E, L L D, Ph.D ১৬ই এপ্রিল ১৮৮০ সালে কেদারনাথকে লেখেন—

'By representing Krishna's character and his worship in a more sublime and transcendent light than has hitherto been the custom to regard him

in, you have rendered an essential service to your co-religionists, and no one would have taken more delight in your work than my departed friend Goldstucker (Theodore Goldstucker, 1821-72, a great authority on ancient Hindu Law and Literature), the zealous advocate the Hindus ever had in Europe' (আ, জী, চ, পৃঃ ১৫৪)।

কেদারনাথের সম্পাদনায় 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয় নড়াইলে, এপ্রিল ১৮৮১ তে (১লা বৈশাখ ১২৮৮)। ১৮৮৩ তে বারাসাত থেকে পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ ইংরাজীতে ছাপা হয় ও তাতে উপেন্দ্র গোস্বামীর 'নিত্যরূপ সংস্থাপন' ইংরাজিতে আলোচনা করা হয়। তৃতীয় বর্ষের প্রকাশ হয় কলকাতা রামবাগানের বাড়ী থেকে 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'র মুখপত্র হিসাবে ১৮৮৫ তে। চতুর্থ বর্ষ (১৮৯২) থেকে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে (আ, জী, চ, পঃ ১৭২)।

১৮৮৬ তে কেদারনাথের জীবনে তুটি উল্লেখযোগ্য সম্মানজনক ঘটনা ঘটে। প্রথমত তাঁকে অম্বিকা কালনার বাঘনাপাড়ার আচার্যকুল 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি দিলেন। এই ভক্তিবিনোদ উপাধিই পরবর্তী জীবনে তাঁর নামে পরিণত হ'ল, আর তাঁর কেদারনাথ নাম গেল চিরতরে হারিয়ে। এই উপাধি সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবন চরিতে (পৃঃ ১৭৬-৭৭) লিখলেন,—'আমার ভক্তিগ্রন্থ ও কার্য্য দেখিয়া শ্রীপাদ আচার্য্যকুল আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে যে পত্র লেখেন তাহার প্রতিলিপি এই—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণৌ জয়তঃ

শ্রীপট্টবাঘনাপাড়া— নিবাসিভির্গোস্বামিভিঃ শ্রীকেদারনাথদত্তায় ভক্তায় শিষ্যায় কৃপয়া ভক্তিবিনোদোপাধিঃ প্রদত্তঃ।

শিষ্যস্য শ্রীমতঃ সাধোর্গোবিন্দচরণৈষিণঃ।
কেদারনাথদত্তস্য জয়ো ভবতু সর্ব্বদা॥
প্রভোশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য মতস্য চানুবর্ত্তিনঃ।
প্রচারকস্য শাস্ত্রাণাং ভক্তিমার্গপ্রবর্ত্তিনাং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়াং তব ভক্তিমনুত্তমাং।
দৃষ্ট্বা কোন বিমুহ্যেত লোকোস্মিন বৈষ্ণবপ্রিয়॥
যাং ভক্তিং লভিতুং শশ্বং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।
তাং ভক্তিং হৃদয়ে ধৃত্বা ধন্যোহসি প্রিয়সেবক॥
জীবস্য জীবনোপায় একা ভক্তির্গরীয়সী।
অতো ভক্তিবিনোদাখ্য উপাধিঃ প্রতিগৃহ্যতাং॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দা ৪০০ মাঘ মাস। শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামিনা। শ্রীতিনকড়ি গোস্বামিনা, শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামিনা, শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামিনা, শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামিনা।... শ্রীকানাইলাল গোস্বামিনা। শ্রীহারাধন গোস্বামিনা।

'আমি প্রভুপাদদিগের কৃপালিপির এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ বাঘ্নপল্লী-বিভূষণৌ।
জাহ্নবীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীর্ত্তিস্বরূপকৌ॥

ব্যাঘ্রোপি বৈষ্ণবঃ সাক্ষাৎ যৎ প্রভাবাদ্বভূব তৎ।
বাল্লা-পল্লাত্মকং বন্দে শ্রীপাটঃ গৌড়পাবনং ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভোর্বংশপ্রদীপকান্ প্রভুন্।
তেষাং প্রসাদলেশেন জড়োপাধৌ গতে মম ॥
ভক্তিবিনোদ প্রখ্যাতির্দাসস্য বিহৃতেধুনা ॥
যেষাং কৃপালবেনাপি ভূষিতোঽহমুপাধিনা।
তেষাং পাদসরোজে মে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবন্নতিঃ ॥

শ্রীরামপুরতঃ। কৃতাঞ্জলি নিবেদনমেতৎ তেষাং চিরসেবকস্য সর্ববৈষ্ণব-দাসানুদাসস্য ভক্তিবিনোদাপাধিকস্য শ্রীকেদারনাথ দত্তস্য।

এখানে প্রসঙ্গত একথা বলা যেতে পারে যে ওপরে উল্লিখিত শ্রীল বিপিনবিহারী গোস্বামীকে অনেকে কেদারনাথের দীক্ষাগুরু বলে থাকেন, কিন্তু কেদারনাথের আত্মজীবন চরিতে গুরুর নামোল্লেখ নেই। ওপরের পত্র-বিনিময়ে কেদারনাথ কারুকেই গুরু বলে সম্বোধন করেননি, তবে তিনি প্রভোর্বংশপ্রদীপকান বলেছেন এবং আচার্যগণও শিষ্য বলে সম্বোধন করেছেন। আবার ওদিকে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল কেদারনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় কেদারনাথের দেহান্তের পর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইংরাজি পুস্তিকায় বলেছেন (১৯১৬, পৃঃ ১৪)—'Thakur formally received his initiation at Narail form a descendat of the Jahnava family of Baghnapara.' প্রভু নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর বংশোদ্ভূত বাঘনাপাড়ার আচার্যদের মধ্যে ওপরে উল্লিখিত একমাত্র শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামীই ছিলেন। অপরদিকে কিন্তু প্রভুপাদ
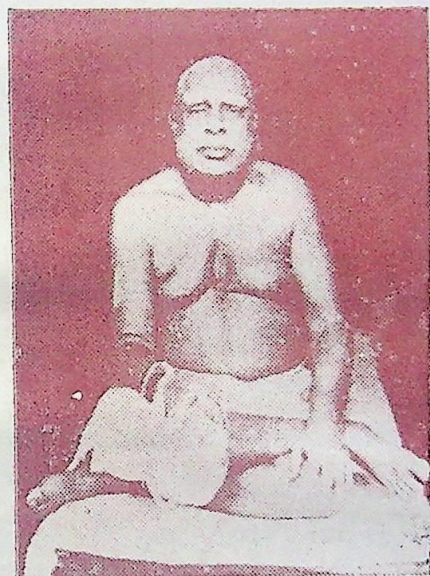
ভজনরত শ্রীকেদারনাথ দত্ত

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

— ১৯০৪ —

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর দীর্ঘদিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য পরমানন্দ বিদ্যারত্ন তাঁর ছোট্ট ভক্তিবিনোদ জীবনী গ্রন্থে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীকেই গুরু বলে উল্লেখ করেছেন।

অথচ দীক্ষা নেওয়ার প্রায় একবছর পরের কথা কেদারনাথ লিখছেন—'১৮৮১ সালে জুলাই মাসে তিন মাস প্রিভিলেজ লিভ পাইলাম। শ্রাবণ মাসে (জুলাইএর শেষে) তীর্থ ভ্রমণে গেলাম।··· (বৃন্দাবনে) রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম' (আ, জী, চ, ১৫৯-৬০)। এরপর এই গ্রন্থে কয়েকবার জগন্নাথ দাস বাবাজীর কথা বলেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে গুরু বলে উল্লেখ করেন নি, যেমন— '(১৮৯০) ১৮ই মে গোদ্রুম, পরদিন নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথ দাস বাবাজীকে ভজন কুটীতে দর্শন করি। পূর্বে কৃষ্ণনগরে থাকা সময়ে এ বাবাজী মহাশয়ের সেবা উদ্দেশে ভজন কুটিতে এক পাকা বারান্দা হয় তাহাতে প্রায় ১৫০ টাকা পড়ে' (পৃঃ ১৮৯)। ইত্যাদি।

১৯০৮ সালে কেদারনাথ (তখন কেবলমাত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) যখন নদীয়া জেলার স্বরূপগঞ্জে নির্জন সুরভিকুঞ্জ কুটীরে গঙ্গাতীরে বাস করতে লাগলেন তখন তিনি কয়েকজনকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবক হিসাবে অনুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত কেদারনাথ বাক্যরহিত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন (এ অবস্থাকে বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা সমাধি বলেছেন)। কৃষ্ণদাস বাবাজী গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ হিসাবে 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ' নামে এক কাব্যগ্রন্থ

লিখেছেন। কিন্তু সেখানেও কেদারনাথের গুরুদেবের নামোল্লেখ নেই।

অবশ্য কেদারনাথ আত্মজীবন চরিতে তাঁর গুরুদেবের নাম সরাসরিভাবে প্রকাশ না করলেও পরবর্তীকালে দুটি গ্রন্থের শেষে শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামীকেই গুরুদেব বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন,—

'বিপিনবিহারী হরি, তাঁর শক্তি অবতরি',
বিপিনবিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামীরূপে, দেখি' মোরে ভবকূপে,
উদ্ধারিল আপন কিঙ্কর॥

(অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ)।

... .

বিপিনবিহারী-প্রভু মম প্রভুবর।
শ্রীবংশীবদনানন্দ বংশ-শশধর॥
সেই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি।
ভাগবত শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি॥

(ভাগবতার্ক মরীচিমালা—উপসংহার)

১৮৮৬-র দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা···স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের প্রশংসায় ও সুপারিশে কেদারনাথকে লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য (Member) করে নেওয়া হল। স্যার হাণ্টারের কেদারনাথ ও তাঁর Maths of Orissa সম্বন্ধে মন্তব্য এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে,—'In 1860 a Pamphlet was put by a native gentleman (Kedar Nath Dutt) who had visited all the larger monasteries of Orissa

and who was himself a landholder in the province. With regard to a little monastery in his own estate, the author adopted an even more vigorous procedure. 'I have a small village (*Chhotimangal-pur* six miles from Kendrapara)", he says "in the country of Cuttack, of which I am the proprietor. In that village there is a religious house, to which was granted, by my predecessors, a holding of rent-free land. The head of the institution gave up entirely entertaining such men as chanced to seek shelter on a rainy night. This came to my notice ; and I administered a severe threat to the head of the house, warning him that his lands would be cruelly resumed if in future complaints of inhospitality were brought to my knowledge." The above remarkable notice was made by a genius. (*Imperial Gazetteer*, pp. 118-119 of '*Orissa*' Vlo, I, 1872).

নদীয়া জেলার বীরনগরে (কেদারনাথের জন্মস্থান উলা গ্রাম) ললিতা-ঠাকুরের আশ্রমে কেদারনাথের স্ব-লিখিত জীবনচরিতের যে পাণ্ডুলিপিটি রাখা আছে সেটি নিতান্তই খণ্ডিত। ভাগ্যক্রমে পুত্র ললিতাপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৬ ?) মূল গ্রন্থটি জাতীয় গ্রন্থাগারে ও অল্প

দু-এক স্থানে এখনও পূর্ণাঙ্গ কিন্তু কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত না হলে ভেজাল উদ্ধৃতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। এই ত্রুটিপূর্ণ উদ্ধৃতি প্রধানত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের 'ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থে আছে।

কেদারনাথ দত্তের স্ব-লিখিত আত্মজীবন চরিতের বহু অংশেরই শাশ্বত সাহিত্যমূল্যের কথা আগেই বলা হয়েছে ; তা ছাড়া সেকালের সমাজ জীবনের অনেক ঐতিহাসিক চিত্রই এ থেকে আমরা পাই। সুতরাং হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আরও একটি চিত্র এখানে উদ্ধার করা যাচ্ছে।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কত বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞান ছিল তার এক দিকের কথা কেদারনাথের অত্যন্ত বেদনাদায়ক শূলরোগের চিকিৎসার বর্ণনায় বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। কেদারনাথ লিখেছেন—'পূর্ণিয়ায় থাকা সময়েই (১৮৬৭) আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঔষধটা প্রস্তুত করিলাম। মুলতানি হিং কোথায়ও না পাইয়া বাথগেট কোম্পানির নিকট হইতে আনাইলাম। শুঁঠ চূর্ণ ৫ তোলা, বিট্‌ লবন ২॥০ তোলা, সোহাগার খৈ ২।০ তোলা ওজন করিয়া খৈ করিতে হয়। হিং দশ আনা। সজিনার ছালের রসে প্রথমে শুঁঠ চূর্ণ মাড়িয়া তাহাতে বিট লবন মিশাইয়া মাড়া গেল। তাহাতে সোহাগার খই মিশাইয়া মাড়া গেল। শেষে হিং মিশাইয়া মাড়া গেল। সজনার ছালের রসের পরিমাণ নাই। যত দিলে ভাল মাড়া যায় এবং ৫৪টি বড়ি হয় ততই দিতে হয়। বড়ি গুলি ষ্টপার্ড ফাইল মধ্যে রাখা গেল। দুইবেলা দুইটা গালে ফেলিয়া জল দিয়া গিলিয়া ফেলিতাম।

২৭ দিন সেবা করা গেল। ইহাতে পুরাতন চাউলের অন্ন, সুপাচ্য তরকারী, ঘৃতপক্ক ও দুগ্ধ পথ্য। লুচি, রুটি, পিঠা, মেঠাই, কাঁচা তৈল, তৈলপক্ক তরকারী, ভাজা, ভুজি, অম্ল, শাক, ডাল, নিষেধ। ঐ ২৭ দিবস মাত্র এই পথ্যাপথ্যের নিয়ম। দুগ্ধ একটু বেশী খাইলে দোষ নাই। আমি পূর্ণিয়াতেই ঐ ঔষধ সেবন করিলাম। খুব বেগে দাস্ত খোলসা হইত। যত বার দাস্ত হইত ততই শরীরের যুত ও বল বৃদ্ধি হইত (আ, জী, চ, পৃঃ ১২৫-২৬)।

এখানেই কেদারনাথ দত্তের অম্লান সাহিত্য প্রতিভাকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে বর্তমান যুগের মানুষের সামনে তুলে ধরার স্বল্প প্রচেষ্টাকে সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু হায়! আধুনিক সাহিত্য-ইতিহাস রচয়িতারা ও শিক্ষিত জনসমাজের কেউই কেদারনাথ দত্তকে আজ চেনেন না। কেদারনাথ নিজের নামে ছাড়াও বিভিন্ন ভণিতায় কাব্য কবিতা রচনা করেছেন, যেমন 'ভক্তিবিনোদ', 'সারগ্রাহী বৈষ্ণব', 'চাঁদ বাউল', 'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার' ও এ-বি-সি। অবশ্য বর্তমান বৈষ্ণবসমাজ তাঁর সমস্ত রচনা থেকেই কেদারনাথ নামটি মুছে দিয়েছেন, ফলে ভক্তসমাজে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুপরিচিত হলেও সাহিত্য-শিক্ষিত সমাজে (এমন কি কিছু ভক্তসমাজেও) কেদারনাথ একেবারে হারিয়ে গেছেন। তাই আজ কেদারনাথকে পুনরাবিষ্কারের এই সামান্য প্রয়াস। এ চেষ্টাও পূর্ণাঙ্গ হ'ল না; আশা করি ভাবীকালের গবেষকগণ পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করবেন; শুধু পথ করে যাওয়া হ'ল। বর্তমান লেখক বার্ধক্যের অক্ষমতা সত্ত্বেও আড়াই বছর ধরে গৌড়ীয় পত্রিকার পাতায় এই বিচিত্র সাহিত্য-স্রষ্টা ও পরম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন মহাভক্তের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি

অর্পণ করেছেন, শুধু এই আশায় যে এই নিবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে গৌড়ীয়ের সীমিত ভক্তগোষ্ঠীর বাইরে বৃহত্তর বিদ্বজ্জন-সমাজও এই অনাবিষ্কৃত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কৃতার্থ হবে।

পরিশিষ্ট

১৯১৪ সালের জুন মাসে কলকাতায় 'ভক্তিভবনে' (১৮১ নং মাণিকতলা স্ট্রীট্) কেদারনাথ দেহরক্ষা করলে (বৈষ্ণব ভাষায় অপ্রকট হ'লে) তাঁর দেহ নিকটস্থ নিমতলা মহাশ্মশানে দাহ করার পর কলকাতার বিদ্বজ্জন সমাজে শোকবন্যা বয়ে যায়। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই তাঁর আবির্ভাব তিথিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেতভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে তাঁর শুদ্ধভক্তির ও সাহিত্যকীর্তির বিশদভাবে উল্লেখ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি' (Thakur Bhakti Vinode Memorail Committee) গঠিত হয়, যার উদ্যোগে ১৯১৫তে বাংলায় ও ১৯১৬তে ইংরাজীতে পর পর দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কেদারনাথের দীর্ঘদিনের সাহিত্য সহকর্মী সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। পুস্তক দুটি বর্তমানে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। ইংরাজি পুস্তকটিতে (A glimps into the life of Thakur Bhakti-Vinode) প্রদত্ত ও আরও কয়েকটি সূত্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করে এই দীর্ঘ নিবন্ধধারার সমাপ্তি ঘটানো যাচ্ছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি কেদারনাথকে সদস্য করে নেওয়ার (MRAS, ১৮৮৬) পরবর্তী কালেও তাঁদের এই বিশেষ মান্য ভারতীয় সদস্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন। কেদারনাথের প্রথমে সংস্কৃতে 'শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্' ও পরে সংযোজনী হিসাবে অনবদ্য ইংরাজীতে 'Sree Chaitanya Mahaprabhu' যখন ইউরোপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলে রীতিমত

সাড়া জাগিয়ে তুলল, তখন বিলাতের ঐ সোসাইটি তাঁদের Royal Asiatic Society-র Journal-এ (পত্রিকায়) January 1897 সংখ্যায় পৃং ১৩০এ লিখলেন,—

'Chaitanya – under the title of Sri Gouranga Lila Smarana Mangala Stotram, the well-known Vaishnava Sri Kedarnath Bhaktivinode M.R.A.S has published a poem in Sanskrit on the life & teachings of Chaitanya. It is accompanied also in sanskrit in which the subject further elucidated is preceded by an Introductian of 63 pages in English in which the doctrines taught by Chaitanya are set out in somewhat full detail, this position and more especially as against Sankar and the Advoita Vedantists, is explaind at length. The little volume will and to our knoledge of this remarkable reformer (Chaitanya) and we express our thanks to Bhakti-Vinode for giving it to us in English & Sanskrit rather than in Bengalee, in which language it must necessarily have remained a closed book to European students of the religious life of India' (সজ্জনতোষণী, ১৮৯৮, ৯।১।২-৩)।
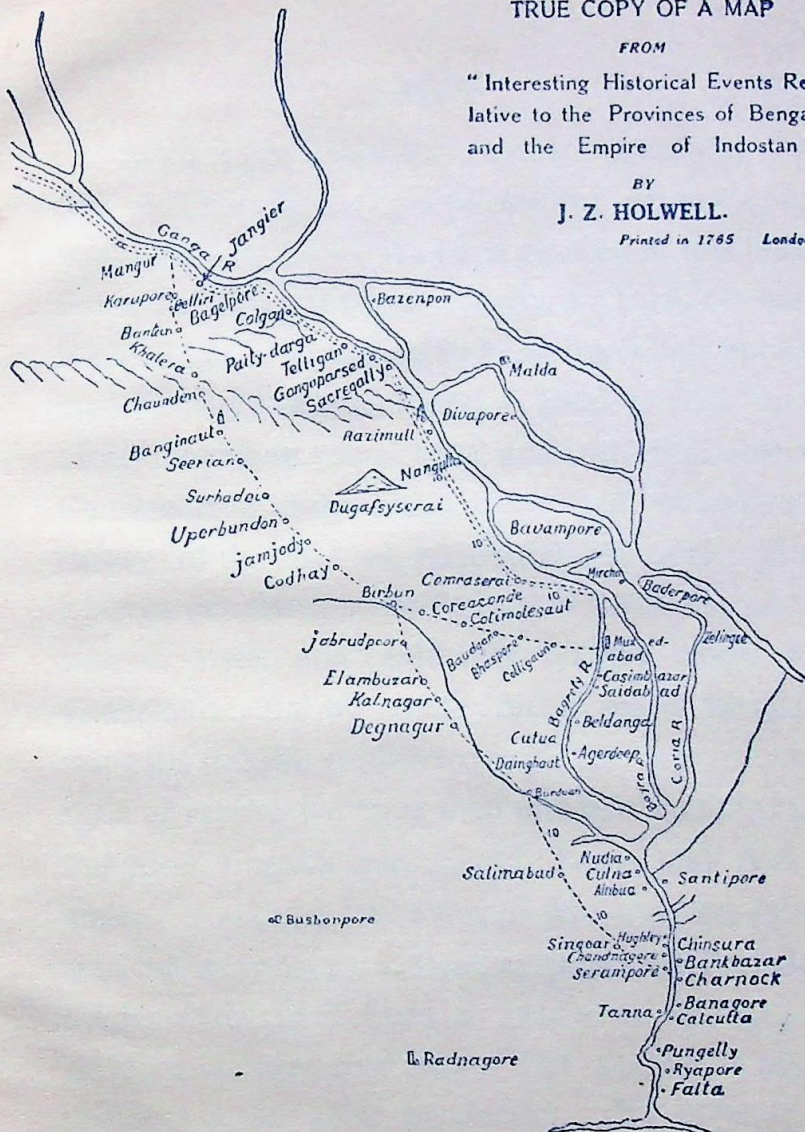
ভাগীরথী ও নতুন 'নুডিয়া' (নবদ্বীপ) সহর
নির্দেশক হলওয়েলের মানচিত্র (১৭৬৫)

১৮৬৩ সালের Calcutta Review পত্রিকার Vol. 39 থেকে কেদারনাথের 'বিজনগ্রাম' 'সন্ন্যাসী' কাব্যদ্বয়ের সমালোচনার কিছু অংশ এখানে দেওয়া গেল—"We have glanced at this little volume of Bengali verse. Many, we trust, of our readers will be interested in knowing what books may be safely recommended as good in style and exceptionable in moral tone, and with that object we intend, if duly assisted, to take occasional survey of the field of vernacular literature. The *Vijangram*. the first poem in this book....is pleasing in style, and evidently on the model of Goldsmith ; and we would rather see a Bengali using his English studies to *purify and improve the style of vernacular verse* than find him composing imitation English epics about Porus and Alexander." এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিজনগ্রামের বিষয়-বস্তু ও ছন্দের উচ্চ প্রশংসা করা হলেও কেদারনাথের পূর্ব-রচিত কাব্য Poriade (Adventures of Porus)-এর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এই সমালোচনায় আরও লেখা হয়েছে—"The *Sanyasi* in two chapters is an abler production....We hope the author will continue to give his countrymen the benefit of his elegant and unassuming pen."

শুধু এখানেই নয় কেদারনাথের ভক্তিসাহিত্য প্রতিভার প্রশস্তি আরও অনেক দূর-প্রসারী ছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক R. W. Frazer তাঁর সুপরিচিত 'A Literary History of India (1907)', গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা লিখতে গিয়ে কেদার-নাথের সবিশেষ উল্লেখ না করে পারেন নি (pp. 349-51)—

'Five (four?) hundred years have passed away since the time Chaitanya spread a faith in the saving grace of Krishna throughout the land, nevertheless down to the present day, the same spirit that inspired Chaitanya continues still to dwell among his followers.

'In an interesting account of the life and precepts of Chaitanya lately published by his devout and aged follower, Sri Kedarnath Dutt Bhakti-Vinode, it can be read how this spirit preserves its vitality undiminished amid the changes that are sweeping over the land. This exponent of the hopes of the present followers of the teachings of Chaitanya declares his firm faith, that from a devoted love to Krishna a movement will yet take place to draw to the future church of the world 'all classes of men, without distinction

of caste or clan to the highest cultivation of the spirit'. This church it appears, will extend all over the world, and take the place of all sectarian churches, which exclude outsiders from the precincts of the mosque, church or temple.

'....The simple piety of this latest preaeher of the teachings of Chaitanya holds that Chaitanya 'showed in his character, and preached to the world the purest morality as an accompaniment of spiritual improvement'. Morality as a matter of course, grace the character of a *bhakta* (one who has faith).

'The perplexing question of idolatory receives its···explanation in the following manner : those who say that God has no form, either material or spiritual and again imagine a false form for worship are certainly idolatrous. But those who see the spiritual form of the deity in their soul's eye, carry that impression as possible to the mind, and then frame an emblem for the satisfaction of the material eye, for continual study of the

higher feelings, are by no means idolatrous.' (সজ্জনতোষণী, ১৯১৬, ১৯৷৩৷৮৯-৯২)।

দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য জগতের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেদারনাথের রচনার সঙ্গে যত্ন করে পরিচয় করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বিশিষ্ট গ্রন্থাদিতে উপযুক্তভাবে স্থান দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুবিখ্যাত সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ পরম বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক কেদারনাথ দত্তকে লিখিত পত্র (পত্রটি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'গৌড়ীয়' পত্রিকার ১৭শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল),—

শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রণামা নিবেদনমিদং,

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন, আর আমরা দীনহীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। (মহাপ্রভুর) প্রকট সময়ে ছয় গোস্বামী ছিলেন, অপ্রকট সময়ে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য ও আপনার কৃপা পাইলে আমি ধন্য হইব। আপনি প্রভু-প্রেরিত, এই শুষ্ককালে আপনি সনাতনধর্ম্ম সজীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (শ্রীধাম-পরিক্রমা) এখনও পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন, কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথা? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন।…শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার

প্রিয়দাস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন দিয়া গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল বিগ্রহ অর্পণ করেন।...ঠাকুর ভগবান্ গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করার অধিকারী কেবল আপনাকে নয়নগোচর হয়। এই নিমিত্ত কাতর হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম।...

কিমধিক, আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত বলিয়া জানিবেন।

23rd November, 1888 প্রণাম
Deoghor via Vaidyanath, **শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস**
E. I. Ry.

মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান উদ্ধার ও সেখানে মন্দির নির্মাণকল্পে কেদারনাথের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভক্ত যখন চাকুরী থেকে অকালে অবসর নিয়ে নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার নামে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহে নামলেন তখন কলকাতার সুপরিচিত সংবাদপত্র Amrita Bazar Patrika ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৪ সালে 'An Amateur Begger' শিরোনামায় লিখেছেন,—

'Babu Kedar Nath Dutta, the distinguished Deputy Magistrate, who has just retired from the service, is one of the most active members (of Nabadwipdham Pracharini Sabha). Indeed, Babu Kedar Nath Dutta has been deputed by the committee to raise subscription in calcutta and elsewhere, and is determined to go from house to house, if necessary, and beg a rupee from each

Hindu gentleman for the noble purpose. If Babu Kedar Nath Dutta, therefore, really sticks to his resolution of going round with a bag in hand, we hope, no Hindu gentleman, whose house may be honoured by the presence of such a devout bhakta as Babu Kedar Nath, will send him away without contributing his mite, however humble it may be, to the Gaur Vishnupriya Temple Fund.'

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতিরক্ষণ সমিতি' কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেদারনাথের সমগ্র রচনাবলী প্রদানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্ট্রারের কেদারনাথ-পুত্র ললিলাপ্রসাদ দত্তকে লিখিত ধন্যবাদ পত্র (সজ্জনতোষণী, ১৮শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১, ১৯১৫/ সম্পাদক বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী) :—

From

P. Bruhl Esq. D. Sc, ISO, FCS, FGS,
Registrar, Calcutta University

No. 8603
Senate House
29.3-1915

To

Babu Lalitaprasad Dutt

Sir,

I have the honour by direction of the Hon'ble the Vice-Chancellor and Syndicate to accept with thanks the 38 volumes of your father's (Late Sri Kedarnath Bhaktivinode) works on Vaishnab Philosophy.

Yours truly
P. Bruhl
Registrar

প্রসঙ্গ রচনাবলী

কেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর) রচিত মূল গ্রন্থগুলি (অনেক ক্ষেত্রে পর্পরিভজি'ত দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণ মাত্র) ভিন্ন প্রসঙ্গ রচনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে এখানে দেওয়া হ'ল,—

১। রামমোহন রায়—ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮)।

২। প্যারীচরণ মিত্র (সম্পাঃ)—Library Gazette (Metcalfe Hall, Calcutta, 1850-60 / later Imperial Library).

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ললিতা (১৮৫৩) ; লোকরহস্য-তে 'বাবু' (বঙ্গদর্শন, ১৮৭২-৭৩) ; কবিতাপুস্তক-এ 'দুর্গোৎসব' (১৮৫৪) ও 'বিরহিণীর দশ দশা' (১৮৭৩) ; ধর্মতত্ত্ব-তে 'প্রীতি' এবং 'সামঞ্জস্য ও সুখ' (১৮৮৬) ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮৮৬)।

৪। কাশীপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাঃ)—The Hindu Intelligencer (Calcutta, 1855-60).

৫। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) ; শূরসুন্দরী (১৮৬৮)।

৬। মধুসূদন দত্ত—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১৪ পৃঃ (১৮৬০) ; পদ্মাবতী নাটক, ৩৪ পৃঃ (কলির উক্তি) (কলকাতা, ১৮৬০) ; তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ৩৩ পৃঃ (১৮৬০) ; মেঘনাদবধ কাব্য, ৯২ পৃঃ (১৮৬১-৬২) ; ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ১৪ পৃঃ (১৮৬১) ; হেক্টর বধ, ৩৯ পৃঃ (১৮৭১)।

৭। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২-৬৫)।

৮। Calcutta Review, Vol. 39 (Senate House, Calcutta, 1863).

৯। নবীনচন্দ্র সেন—রৈবতক-এ 'পূর্বস্মৃতি' (১৮৬৬); অবকাশরঞ্জিনী-তে 'পিতৃহীন যুবক' (১৮৭১); রঙ্গমতী (উৎসর্গপত্র/১৮৮০)।

১০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ভ্রান্তিবিলাস, ৫৭ পৃঃ (১৮৬৯)।

১১। কেশবচন্দ্র সেন—পত্রাবলী : লন্ডন, ১৮৭০ (কলকাতা, ১৯৪১)।

১২। William Hunter—Imperial Gazetteer, Orissa, Vol. I, pp. 118-19 (London, 1872); Statistical Account of Bengal, Vol. I, pp. 356-72 (1880).

১৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী—সারদামঙ্গল (১৮৭৯)।

১৪। কেদারনাথ দত্ত (সম্পাঃ)—সজ্জনতোষণী, ১ম-১৭শ বর্ষ (কলকাতা, ১৮৮১-১৯১৪)।

১৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'আনন্দমঠ' সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসুকে রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৮৮৪ (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পৃঃ ১৪৭/১৩৬৭)।

১৬। চন্দ্রনাথ বসু—'আনন্দমঠ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর, ১৮৮৪ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৪৪)।

১৭। রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদ সংহিতা, ৫০২ পৃঃ (১৮৮৫); সংসার, ১০০ পৃঃ (১৮৮৬); নব্যভারত পত্রিকায়—'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (১৮৯১)।

১৮। প্রমথ চৌধুরী—'জয়দেব', ১৮৯০ (প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম, ১৯৫২)।

১৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সামাজিক প্রবন্ধ-তে 'ভবিষ্য বিচার' (১৮৯২)।

২০। শিশিরকুমার ঘোষ/মতিলাল ঘোষ (সম্পাঃ)—Amrita Bazar Patrika (Dec. 1894, Septs. 1915, 1916, 1918, 1926).

২১। কৃষ্ণদাস, কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—সম্পাঃ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ (১৮৯৫-৯৬); সম্পাঃ বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (বার্ষভানবী দয়িতদাস/১৯১৫); সম্পাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ (৩য় সং, ১৯৫০)।

২২। কেদারনাথ দত্ত—স্ব-লিখিত আত্মজীবনী (আত্মজীবন চরিত) ২০৩ পৃঃ, (কলকাতা, ১৮৯৬ ?)।

২৩। গোবিন্দচন্দ্র দাস—ফুলরেণু (১৮৯৬)।

২৪। Royal Asiatic Society—Journal, Jan. 1897, p. 130.

২৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী, পৃঃ ১৩৬-৩৭ (১৮৯৮)।

২৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত ও প্রতিঘাত (১৯০০)।

২৭। R. W. Frazer—A Literary History of India, pp. 349-51 (1907).

২৮। কৃষ্ণদাস বাবাজী—ভক্তিবিনোদ চরিত (পদ্যে), ১২+১৪১ পৃঃ (১৯১৪)।

২৯। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী) (সম্পাঃ)—সজ্জনতোষণী, ১৭শ-২৪শ বর্ষ (১৯১৪-২৭); Harmonist (1927-34).

৩০। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী, ২৪ পৃঃ (কলকাতা, ১৯১৫); A glimpse into the life of Thakur Bhakti-Vinode, 2+42p. (Krishna-nagar, 1916).

৩১। অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ, হরিপদ বিদ্যারত্ন ও সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (সম্পাঃ)—গৌড়ীয়, ১ম-১৯শ (মায়াপুর, ১৯২২-৪১)।

৩২। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১০৬-৭ (১৯২৫)।

৩৩। প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)—নদীয়াপ্রকাশ (মায়াপুর, ১৯২৬-৩৫)।

৩৪। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—গীতি-সাহিত্যে ভক্তিবিনোদ, ১৪৪ পৃঃ (১৯৩৮); ভক্তিবিনোদ বাণী বৈভব (১৯৩৮, সংকলন) ; ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ, ১২+১১৬+১৬ পৃঃ (১৯৩৯ ?)।

৩৫। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব (সংকঃ)—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১ম, ১৩৮ পৃঃ (১৯৫০)।

৩৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ-তে 'কাব্যকথা' (১৯৫০)।

৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, ২য়, পৃঃ ৩৩ (১৩৫৯/১৯৫২)।

৩৮। অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ভূমিকা / 'প্রবন্ধ সংগ্রহ-১ম'—প্রমথ চৌধুরী (১৯৫২)।

৩৯। সুশীলকুমার দে—নানা-নিবন্ধ-তে 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' (১৯৫৪)।

৪০। পরমানন্দ বিদ্যারত্ন—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ১০+৬৪ পৃঃ (২য় সং, ১৯৫৯)।

৪১। ভক্তিকুসুম শ্রমণ—প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর, ২৬+৪০০ পৃঃ (২য় সং, ১৯৬৮)।

৪২। শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর (প্রকাঃ)—Thakur Bhakti-Vinode, 2+22p. (1971).

৪৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৩৮-৩৯, ৫৮৩-৮৪ (কলকাতা, ১৯৭১)।

৪৪। K. N. Mukherjee—'A study of Sri Chaitanya's birthplace' in Indian Journal of Landscape Systems, ILEE, Vol. 7, No. II, pp. 33-56 (Calcutta, 1984).

৪৫। বি. এন. ভরদ্বাজ—গৌড়ীয়ের ইতিবৃত্ত (গৌড়ীয়, ৩১ বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, ১৯৮৭); বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ও নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত (গৌড়ীয়, ৩৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৯)।

শব্দসূচী

লেখক পরিচিতি ঃ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বানারসীনাথ ভরদ্বাজ (৬৫) স্ব-নামে পার্থিব-বিজ্ঞান ও পরিবেশ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক এবং অনেকগুলি গবেষণা গ্রন্থের ও পত্রের দেশে-বিদেশে প্রশংসিত লেখক হলেও নানা ছদ্মনামে বহুকাল থেকে রঙ্গচিত্র (কার্টুন) অঙ্কন ও সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। কাব্যরসিক ও ছান্দসিক হিসাবে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের উচ্চতম ক্ষেত্রে (সাহিত্যভারতী) তিনি দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেছেন। লেখক ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যেও সমানভাবে পারদর্শী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অর্ধশত বছরেরও বেশী অভিজ্ঞ ও স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ।